চিঠি ৩য় খণ্ড

—লেখা—

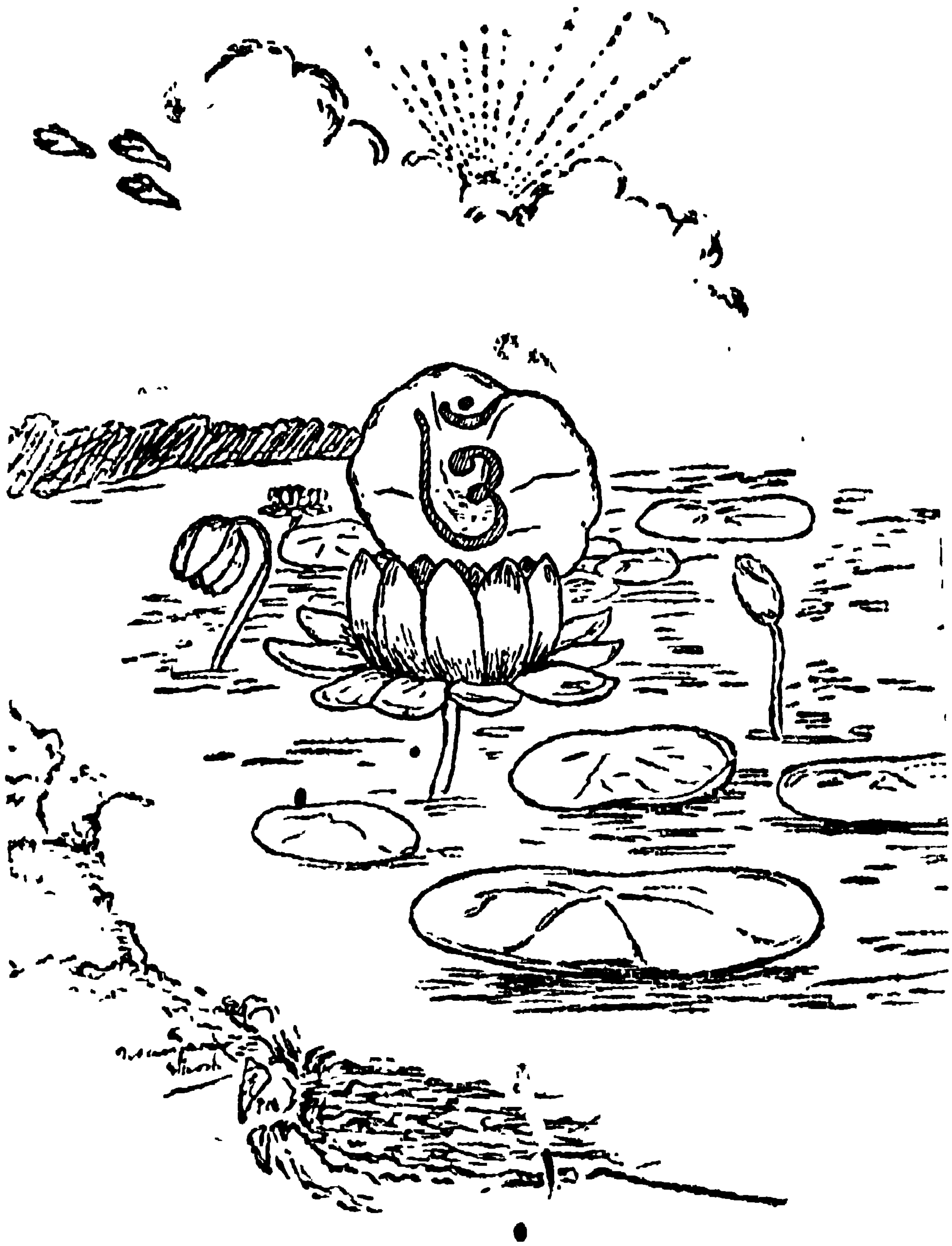

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত সংকলিত

প্রকাশকমণ্ডলীর অনুমত্যনুসারে—
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ;
২৫।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৬

সর্ব্বস্বত্ব-সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশকের নিকট ও
ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং, ২৪ কলেজ ষ্ট্রীট

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ;
মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

সন্ন্যাসীদাদার কতকগুলি চিঠি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া "দেখা" নামে প্রকাশিত হইল। 'দেখা' শুধু চোখ দিয়া রূপ দেখায় সীমাবদ্ধ নহে। দেখার স্থূল অর্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ হইলেও সূক্ষ্ম অর্থ বিচার ও অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করা। স্বরূপদর্শন ও সর্ব্বত্র ভগবৎবিভূতি আস্বাদনেই দেখার পূর্ণতা। সব কাজের পূর্ণ পরিণতি ও সামঞ্জস্যই যে প্রকৃত সাধনা, সব কাজই যে পূজায় পরিণত হয়, এই ভাবের কথা এই সকল চিঠির মধ্যে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের অন্তর্গত পত্রে যজ্ঞ ও দেবতা প্রভৃতি তত্ত্বসম্বন্ধে আভাস মাত্র পাই। এ সকল বিষয়ে যে সব পত্রে বিশদ আলোচনা আছে, সেগুলি পরে প্রকাশিত হইবে।

যাঁহাদের আন্তরিকতায় ও সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

বিনীত

শ্রীসুশীল কুমার গুপ্ত

রাখী পূর্ণিমা, ১৩৩৬

বিবৃতি

৮ পৃষ্ঠা—বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী ও পরা—আমাদের ভিতরে স্থূল-শরীর সূক্ষ্ম শরীর কারণ-শরীর জীবাত্মা ও পরমাত্মা এইকয়টী তত্ত্ব রহিয়াছে। স্থূল ও সূক্ষ্মের ভিতরকার আবরণকে বৈখরী, সূক্ষ্ম ও কারণের মধ্যে মধ্যমা, কারণ ও জীবাত্মার মধ্যে পশ্যন্তী, এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পরা আবরণটি রহিয়াছে। এই চারিটী আবরণ দূর করাই তাত্ত্বিক বস্ত্রহরণ-রহস্য। ইহার পরে সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

১২ পৃষ্ঠা—লয়লা ও মজনু—গল্পটী বন্ধুগণ অনেকেই শুনিয়াছেন। আমরা যে ভাবে শুনিয়াছি, তাহা প্রচলিত নাটকীয় আখ্যানের সঙ্গে মেলে না। গল্পটির উপকরণ একজন সুফী সাধকের নিকট প্রাপ্ত। লয়লা ও মজনুর পরস্পর দেখা হওয়ার পর হইতেই উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ এক বিস্ময়কর অবস্থা আনয়ন করিল! দুজনেই এক অপূর্ব্ব ধ্যানের ভাবে কাজ করেন চলেন ফেরেন, কখনও বা প্রেম-সমাধিতে বিভোর থাকেন। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রেমাস্পদের দর্শন—ভগবৎদর্শন জীবনে দেখা দিল। এইভাবেই দুজনের জীবন-লীলার শেষ হইয়া গেল। বিস্তারিত ঘটনা এস্থানে বলা সম্ভব হইল না।

২৫ পৃষ্ঠা—মঞ্জরী—বৈষ্ণব-শাস্ত্রে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানে তৎপরা। সখীগণ তাঁহার কায়ব্যূহরূপা—তাঁহাদের ভিতর দিয়া শ্রীরাধার এক-এক গুণ এক-এক ভাব বিকাশ পায়, তাঁহারা সেই সেই ভাবাবলম্বনে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সহায়; মঞ্জরীগণ সখীদিগের সহকারিণী—রাধা-কৃষ্ণলীলায় যথাসম্ভব উপস্থিত

থাকিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন। তাত্ত্বিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা-স্থানীয়, শ্রীরাধা জীবাত্মাস্থানীয়া, সখীরা মনোবৃত্তি এবং মঞ্জরীগণ প্রাণবৃত্তি-স্থানীয়।

২৫ পৃষ্ঠা—**কায়ব্যূহ**—ভগবৎবিকাশের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন স্তরে অনুভূত তত্ত্বগুলি কায়ব্যূহ-রূপে বর্ণিত। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারিটী তত্ত্ব কায়ব্যূহ নামে প্রসিদ্ধ। ভগবান বাসুদেব যখন জগৎ সৃষ্টি করিতে সঙ্কল্প করেন, তখন তাঁহার সংকর্ষণ নামক অংশ তাহা হইতে বহির্গত হইয়া নিকটস্থ প্রকৃতি-পুরুষকে ক্ষোভিত করে। ক্ষুব্ধ প্রকৃতি-পুরুষ হইতে বুদ্ধি-লক্ষণ মহৎতত্ত্ব আবির্ভূত হয়, ইহাই প্রদ্যুম্ন-তত্ত্ব। পরে অহংকার অভিব্যক্তাবস্থায় অনিরুদ্ধ নামে কথিত হয়। কাহারও মতে তাত্ত্বিক ভাবে চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মনে অধিষ্ঠিত চৈতন্য—এই চারিটাই উক্ত নামে প্রসিদ্ধ। সখীগণকে শ্রীরাধার কায়ব্যূহ বলা হয়। ব্যূহ-রূপ দুর্গের মধ্যে সার তত্ত্ব নিহিত, ব্যূহের মধ্য দিয়া তিনি প্রকাশ পান লীলা করেন।

১৯৭ পৃষ্ঠা—**রসোদ্গার শুভ্র**—বহ্মানন্দে কৃষ্ণসহ মিলনানন্দে যে রস একবার আস্বাদ করা হইয়াছে, তাহারই উদ্গার রসোদ্গার। শ্রীরাধা কৃষ্ণসঙ্গে যে বিমল আনন্দ আস্বাদ করিয়াছিলেন, সখীগণের নিকট তাহার একটা আভাস দিতে চেষ্টা করেন—আস্বাদ্য বিষয়ের এই পুনঃ পুনঃ অনুশীলনই রসোদ্গার-নামে পরিচিত। তাত্ত্বিক ভাবে জীবাত্মা সমাধি অবস্থায় পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া যে আনন্দরস আস্বাদ করিয়াছিলেন, ধ্যানের অবস্থায় তাহার অনুচিন্তনই সাধকদের আস্বাদ্য রসোদ্গার-তত্ত্ব।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	৭	নজরুরের	নজরুর
১৪	১০	শিক্ষোর	শিক্ষার
২৩	১৬	ধম্ম	ধর্ম্ম
৩০	১২	গুহ্য	গুহা
[illegible]	১০	তঁহার	তাহার
[illegible]	৬	তোমার	তাহাকে তোমার
৫৩	৩	বিপরীত	বিপরীত অর্থাৎ অবিরোধী
৬২	১০	সাহায্যে	সাহায্য
৬৩	৭	তাহা	তাহার
৬৬	৮	প্রকৃতি	প্রকৃতির
৬৯	৩	পারো	পারে
৭১	১১	বক্তব্যঃ	বক্তব্য
৭২	১	প্রকৃতি ও পুরুষের	পুরুষ ও প্রকৃতির
৮২	৮	এক প্রণবাত্মক	এক
৮৪	১৮	দর্পন	দর্পণ
৮৭	১৬	মহারাজেশ্বরা	মহারাজেশ্বরা
৮৯	১১	আসিক্ত	আসক্তি
১৩১	১০	পাইবে, যে	পাইবে যে,
১৪৩	১১	আনন্দময়	আনন্দময়-কোষ
১৬৩	১২	দিব	দিয়া
২১৯	৬	মত্তিপ্রকাশের	মত্তি প্রকাশের

Presented to D. B. Libra
By
S. S. Kar
5. 1. 1931

দেখা

ছে, সে

গুলিও সেই

ওঁ

'দেখা' শব্দটা দর্শন করার অপভ্রংশ মাত্র। এই দর্শন করার অর্থ শুধু চোখ দিয়া রূপদর্শন করায় পর্য্যবসিত হয় না।

দেখা দর্শন করার অর্থই হইতেছে উপলব্ধি করা প্রত্যক্ষীভূত করা সাক্ষাৎকার (realise) করা। দর্শন-শাস্ত্র কথাটাও এই ভাবেই বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। সেই দর্শনকে আমরা এখন শুধু শ্রবণ ও কথন-তত্ত্বে শেষ করিতে গিয়াই তো যত গোলমাল করিয়া বসিয়াছি; সেই শ্রবণ ও কথনও যে আবার স্থূলে সীমাবদ্ধ হইতে বসিয়াছে। চোখ দেখে রূপ, কান শোনে শব্দ, নাক গ্রহণ করে গন্ধ, ত্বক অনুভব করে স্পর্শ, জিহ্বা গ্রহণ করে আস্বাদ, মন গ্রহণ করে সংস্কার—ইহার সব তত্ত্বগুলিই যে আমাদের দর্শন-শব্দের অন্তর্গত। এক-একটি জিনিস দর্শন করিবার জন্য ভগবান আমাদিগকে এক-একটি ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন। স্থূল বিষয়গুলি বাহিরের তত্ত্বগুলি গ্রহণ করিবার জন্য দিয়াছেন বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি, সূক্ষ্ম ও কারণ-তত্ত্বগুলি দেখিবার জন্য অনুভব করিবার জন্য দিয়াছেন ভিতরকার অন্তর-ইন্দ্রিয়গুলি—মন বুদ্ধি অহংকার ও চিত্ত-নামক তত্ত্বগুলি। তত্ত্বগুলি যেমন স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে, সেই তত্ত্বগুলি অনুভব করিবার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিও সেইরূপ স্তরে

স্তরে সাজান রহিয়াছে। ভিতরের দিকে আত্মার দিকে যাইবার সময় নীচের তত্ত্বগুলি তাহার অব্যবহিত উপরের তত্ত্বগুলি দর্শন করে, আবার ভিতর হইতে বাহিরের দিকে উপর হইতে নীচের দিকে নামিবার সময় উপরের তত্ত্বগুলি নীচের তত্ত্বগুলি দর্শন করিয়া থাকে। একটা অন্তর্মুখী দৃষ্টি আর একটা বহির্মুখী দৃষ্টি। জগৎ সৃষ্টির সময় পরমাত্মার ইচ্ছা হইল বহু হইতে, দৃষ্টি পড়িল বাহিরের দিকে; লয়ের সময় মহাপ্রলয়ের সময় আবার তাঁহার ইচ্ছা হয় এক হইতে, সবকে টানিয়া ভিতরে লইয়া যাইতে; সেজন্য দৃষ্টিটা হয় অন্তর্মুখী। আমাদেরও জাগ্রদবস্থায় বহির্মুখে দৃষ্টিটা অনুভবের গতিটা প্রসারিত হইয়া থাকে। সাধকগণ সিদ্ধ ঋষি-মুনিগণ এই দর্শন-ক্রিয়ার স্বরূপ অন্বেষণ করিতে গিয়া মূল তত্ত্ব আস্বাদ করিতে গিয়া আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন যে আত্মাই আত্মাকে আত্মার বিভূতিকে দর্শন করে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমাদের দেখার কাজটা সব জিনিসের ভিতর দিয়া গিয়া আত্মা পর্য্যন্ত প্রসারিত না হইবে, যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে সর্ব্বতত্ত্বে আত্মা পর্য্যন্ত দেখিতে সক্ষম না হইবে, সে পর্য্যন্ত যে দেখার ক্রিয়া পূর্ণ হয় না দেখাটা সার্থক হয় না। আধ্যাত্মিক ভাবে স্বরূপ ভাবে দেখার অর্থই আত্মাকে দেখা, সূক্ষ্ম কারণ ভাবে আধিদৈবিক ভাবে দেখার অর্থই ভিতরকার সূক্ষ্ম ভাবগুলিকে দেখা, স্থূল ভাবে দেখার অর্থ স্থূল রূপটাকে স্থূল তত্ত্বটাকে দেখা। যে যেমন

অধিকারী সে তেমন দেখে, স্বরূপ-দর্শনকারী স্বরূপ দর্শন করে লীলা-দর্শনকারী লীলা দর্শন করে; উভয়-দর্শনকারী স্বরূপও দেখে লীলাও দেখে। বলা বাহুল্য আমাদের দেখা শুনা ভাবা অনুভব করা অনেকটা স্থূলে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আমরা অনেকটা স্থূলদর্শী হইয়া পড়িয়াছি; তাই সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি আমাদের নিকট এতটা অদৃষ্ট যে অনেক সময় ঋষি-মুনিদের কথায় প্রকৃত দ্রষ্টাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেও আমরা সব সময় সক্ষম হই না। ইহার ফলে যে আমরা কতটা বঞ্চিত হই তাহাও আমরা ভাবিয়া দেখিবার সব সময় সুযোগ পাই না। ব্যাসদেব শিষ্যদেরে ব্রহ্মতত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্ব দর্শন করাইতে গিয়া কিছু পরেই সমাধিমগ্ন হইলেন। তিন দিন পরে সমাধিভঙ্গ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কতটা দর্শন করিয়াছ? তাহাদের উত্তর শুনিয়া ব্যাসদেব অবাক হইয়া গেলেন, বলিলেন তোমাদের কোনও দোষ নাই—আমারই ভুল হইয়াছে; কি ভাবে দর্শন করিতে হয় সে তত্ত্ব আমি তোমাদিগকে আগে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিই নাই। যতক্ষণ আমি মুখ দিয়া বলিয়াছি ততক্ষণ তোমরা কান দিয়া শুনিয়াছ; তার পরে আমি মুখের অতীত তত্ত্বে গিয়া ক্রমে ক্রমে প্রাণ মন বিজ্ঞান দিয়া আনন্দ দিয়া স্বরূপ দিয়া বলিতে আরম্ভ করিলাম। তোমরা কানের উপরে যে উঠিতে হয়, প্রাণ মন আত্মা দিয়া যে বুঝিতে

চেষ্টা করিতে হয় তাহা জানিতে না, তাহার একটা আভাস পাইলেও তাহা সাধনা দ্বারা ব্যবহার দ্বারা আপনার করিয়া তুলিয়া সহজ করিয়া তুলিয়া কাজে লাগাইতে অভ্যস্ত ছিলে না।

আমরা দেখি সংস্কারে রঞ্জিত অজ্ঞান-কুয়াসায় আবৃত চোখ দিয়া, চিন্তা করি আমাদের অশুদ্ধ বিকৃত মন দিয়া ; এই ভাবে আর কত দূর দেখা যায় অনুভব করা যায়! প্রকৃত ভাবে দেখিতে হইলে আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে সংযম করিতে হইবে আমাদের ভিতর-বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা আমাদের সমস্ত দেখা শুনা অনুভব করাকে যে আমরা আমাদের সংস্কার দ্বারা অজ্ঞানতা দ্বারা স্বার্থ দ্বারা একান্তভাবে বিকৃত করিয়া—আমাদের চশমার দোষটা ইন্দ্রিয়ের দোষটা অনুভবের দোষটা দৃশ্য পদার্থে আরোপিত করিয়া সমস্ত দৃশ্য পদার্থকে বিকৃত করিয়া দিব। দেখিয়াছিলেন ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ, যখন তিনি জলে স্থলে আগুনে সর্ব্বত্র তাঁহার প্রাণের বিষ্ণু ভগবানকে সন্দর্শন করিয়াছিলেন। দেখিয়া ছিলেন আমাদের প্রাণের গোরাচাঁদ, যখন তিনি ছাত্রদেরে পড়াইতে গিয়া এক কৃষ্ণবর্ণ শিশুকে চোখের সামনে মুরলী বাজাইতে দেখিয়া তাহার রূপে গুণে মোহিত হইয়া ভগবৎমহিমা বর্ণনা করিতে করিতে সমাধিমগ্ন হইয়া যাইতেন। দেখিয়াছিলেন একদিন বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণী, যখন তাঁর চোখ কৃষ্ণের

রূপ ছাড়া আর কিছু দর্শন করিতে পাইত না 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি' হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, যখন তাঁহার কান কৃষ্ণের মুরলী রব ছাড়া আর কিছু শুনিতে পাইত না, মন কৃষ্ণের রূপ গুণ প্রেম ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করিতে সমর্থ হইত না। প্রকৃত তত্ত্বই যখন এই যে তিনিই বহুরূপে জীবজগৎ-রূপে বিবর্ত্তিত বা পরিণত হইয়াছেন, তিনি ছাড়া আর কেহ বা কিছু নাই 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ভগবান ছাড়া আর কিছু দেখিব ভাবিব ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের সেই দেখাটা যে পূর্ণ সফলতা লাভ করে নাই তাহাতে কি আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে? রহিয়াছে রজ্জু দেখিতেছি সর্প, প্রচার করিতে বসিয়াছি সর্পের অস্তিত্ব—রজ্জুর অভাব-তত্ত্ব! চরম নাস্তিকতা! এ দেখাকে আর প্রকৃত দেখা কি করিয়া বলা যাইতে পারে। দেখার জন্য ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হইবে চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত করিতে হইবে মনকে যাবতীয় অজ্ঞানতা কামনা বাসনা আসক্তির মলিন সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া ভগবৎকৃপা-লাভের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহার পরে তো তিনি ভগবৎরূপ-দর্শনে ভগবৎলীলা অনুভব করিবার জন্য আমাদিগকে বরণ করিবেন; সুতরাং আমরা যে চোখ থাকিতেও দেখি না (Having eyes we see not) এটা ধ্রুব সত্য কথা। না দেখিয়াও যে দেখি মনে করি, না পাইয়াও যে পাইয়াছি বলিয়া তৃপ্ত থাকি এটা আমাদের ঘোর বিকারের অবস্থা।

ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রকৃত বৈদ্যরাজের আশ্রয় লইয়া আমাদিগকে এ বিকার দূর করিতে হইবে।

আমরা অনেক সময়ই বাস্তবিক দেখিতে ভুল করি। আমরা সকলেই দেখি—সাধুও দেখে অসাধুও দেখে, ভক্তও দেখে

তিন রকমের

অভক্তও দেখে; কিন্তু ইহাদের

দেখা

অনুভূত দৃশ্যগুলির বর্ণনার ভিতর থাকে আকাশ-পাতাল পার্থক্য! এক দেখার ভিতরে এত পার্থক্য কেন হয় জানিতে চাও? এ বিষয়ে তিনটি তত্ত্ব চিন্তনীয়—যে দেখে, যাহা দ্বারা দেখে, এবং যাহাকে দেখে। যাহাকে দেখে সে যদি ক্রমাগত রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে থাকে, সে যদি ভিতর-বাহিরকে খুব বিরুদ্ধভাবাপন্ন করিয়া দেখা দেয় অর্থাৎ তাহার বাহিরটা যদি ভিতরের প্রতিমূর্ত্তি না হয়—সোজা কথায় সে যদি অসরল হয়, তবে তাহাকে দেখার সম্বন্ধে অনেক রকমের ভুল হইতে পারে। তার পরে যে দেখে সে যদি স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয় অর্থাৎ আত্মদর্শী হয়, তাহা হইলে সে দৃশ্য-পদার্থের সব পরদাগুলি—বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী ও পরার আবরণগুলি ভেদ করিয়া দৃশ্য পদার্থের সব তত্ত্বগুলিই

ঠিকভাবে দেখিতে সক্ষম হইবে, তাহার দেখার মধ্যে কোথাও ভুলচুক ততটা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। আর দ্রষ্টা যদি অহং-ভাবাপন্ন হয় তবে তাহার অহং-ভাব দ্বারা স্বার্থ ও সংস্কারের রংএর দ্বারা মনের চঞ্চলতা দ্বারা দৃশ্যকে অন্য ভাবে দেখাই যে স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। যার মন যে রকম সে অপর সকলকে অনেকটা সেইভাবে ভাবিত দেখিতে বাধ্য। চিত্তটা মনটা কতকটা যেন আয়নার মত, তাহার দোষ-গুণ দ্বারা দৃশ্য রূপান্তরিত মনে হয়। 'বিশ্বং দর্পণ-দৃশ্যমান-নগরী-তুল্যং নিজান্তর্গতং' স্তবটি মনে কর। তার পর যাহার সাহায্যে দেখিবে সেই অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় যদি দূষিত ও বিকৃত হয় তাহা হইলে যে কোনও জিনিসই ঠিকভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা বোধ হয় বেশ সহজে বুঝিতে পার। আমরা যে রংএর চশমা দিয়া দেখিব দৃশ্য পদার্থকেও সেই রংএ রঞ্জিত মনে করিব। হলদে রংএর চশমা চোখে দিয়া দেখিলে সাদা দেওয়ালকেও যে হলদে মনে হইবে। এখানে দেওয়ালটী কিন্তু যে-সাদা সে-সাদাই থাকিয়া যায়, যদিও আমরা শুধু আমাদের চোখের দোষে সাদাকে হলদে মনে করিয়া অযথা নানারূপ বিরোধ ও অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বসি! "অতি দূরাৎ সামীপ্যাৎ ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ মনোঽনবস্থানাৎ সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাৎ অভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ন তৎস্বরূপোপলব্ধিঃ"। অতিদূর অতি সামীপ্য ইন্দ্রিয়বৈগুণ্য মনের চঞ্চলতা সূক্ষ্মতা ব্যবধান

অভিভব ও সমানাভিহার থাকিলে বস্তুকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। দিনে যে নক্ষত্র দেখিতে পাও না এটা অভিভবের দৃষ্টান্ত। অনেক ছেলে একসঙ্গে পড়িতে থাকিলে তাহার মধ্যে আপন পুত্রের অধ্যয়ন-শব্দ ভাল করিয়া চিনিতে পারা যায় না, এটা সমানাভিহার জন্য। বিজ্ঞান বলেন, দৃশ্য পদার্থ চোখের অতি সন্নিকটে থাকিলে নাকি তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহার কারণ সামীপ্য। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মাঝে দেওয়াল আদির ব্যবধান থাকিলে যে দেখা যায় না তাহা ত সকলেই জানে। ইন্দ্রিয় ব্যাধিগ্রস্ত হইলে মন চঞ্চল থাকিলে যে দেখায় নানারূপ বিঘ্ন ঘটে তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। আমাদের মন চঞ্চল ইন্দ্রিয় অসংযত চিত্ত সংস্কার দ্বারা রঞ্জিত বলিয়াই আমাদের দৃষ্টি আমাদের অনুভব-শক্তি অনেক সময় রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া নানারূপ অনর্থের সৃষ্টি করিয়া বসে। চিত্ত শান্ত ও শুদ্ধ না হইলে যে কোন জিনিসই ঠিক ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা দেখি স্বার্থের চোখ দিয়া সংস্কারের চোখ দিয়া মৎলবের চোখ দিয়া, তাই তো আমরা সেই পরম সুন্দরের বিলাস-বিভূতিকে সেই পরম প্রেমাস্পদের লীলাখেলাকে পর্য্যন্ত ভীষণ বীভৎস-রূপে গ্রহণ করিতে বর্ণনা করিতে সামান্য একটু কুণ্ঠাও বোধ করি না। নিমগাছ দেখিয়া বলি—ও, ওটা যে একটা নিমগাছ—ওর পাতা, নিমবেগুন খেতে লাগে; বাস্, এখানেই আমাদের দেখা ভাবা সব শেষ হয়ে যায়! মানুষকে

দেখিয়া মনে করি—ও-যে রামবাবু, ওর কাছে দশটা টাকা পাওয়া যাবে; বাস্, এইরূপেই ভগবানের এক-একটা অদ্ভুত সৃষ্টিকে আমরা শেষ করিয়া ফেলি। এইভাবে আমাদের দৃষ্টিতে নীলাকাশ শুধু একটা নীলাকাশ মাত্র, ফুলগুলি সামান্য কতকগুলি ফুল, ছেলেমেয়েগুলি একটা বিরক্তির সামগ্রী! আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না জ্ঞানিগণ প্রেমিকগণ সাধকগণ এসব দৃশ্য দেখিয়া কেন বিমোহিত হন, কেন এ দৃশ্যগুলিকে সেই 'আনন্দরূপমমৃতম্'এর বিলাস-বিভূতি মনে করিয়া ইহাদের রূপের ভিতর দিয়া সেই অরূপীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া গিয়া 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃক্ষ-রূপেণ সংস্থিতা' মনুষ্য-রূপেণ সংস্থিতা আকাশ-রূপেণ কুমার-কুমারী-রূপেণ পুষ্প-রূপেণ সংস্থিতা বলিয়া ইহাদের পায় লুটিয়া পড়িয়া ইহাদের ভিতর দিয়া আমাদের সেই প্রাণারামের দর্শন ও সেবার অধিকার লাভ করিয়া জীবন সার্থক মনে করেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের চোখে পুরীর জগন্নাথ-মূর্ত্তি এবং সাধারণ জীবের চোখে ঐ জগন্নাথ-মূর্ত্তির ভিতরে যে কত পার্থক্য তাহা আমরা অনেক সময় ভাবিয়া দেখি না। আমাদের চারিদিকে এক-একটা সংস্কারের স্বার্থের প্রাচীর খাড়া করিয়া দিয়া আমরা নিজের তৈয়ারী এক-একটা সীমাবদ্ধ জেলখানায় আবদ্ধ থাকিয়া যে কতভাবে দেখিতে শুনিতে পাইতে ভোগ করিতে বঞ্চিত হইয়া পড়ি, তাহা যে আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না! মা কি ভাবে ছেলের মুখখানির দিকে তাকাইয়া থাকেন ছেলের

মুখের ভিতরে কত কি অলৌকিক রূপলাবণ্য স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করেন তাহা যে মা ছাড়া অন্যে বুঝিতে পারে না। সে দৃশ্য দেখিতে হইলে মার চোখের মত চোখ লাভ করা দরকার। স্ত্রী যে তাহার স্বামীর রূপের মধ্য দিয়া কথার মধ্য দিয়া কত কি স্বর্গীয় ভগবৎবিভূতি আস্বাদ করিয়া সমাধিমগ্ন হইয়া যান তাহা সাধারণ লোকে আর কি করিয়া বুঝিতে পারিবে? লয়লার মুখের সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে মজনুরের চোখ চাই। কৃষ্ণ-প্রেম আস্বাদ করিবার জন্য চৈতন্যদেবের কেন যে রাধাভাবে ভাবিত হইতে হইয়াছিল তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। শঙ্কর কেন শিবপ্রেমে পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ কেন তাঁহার বিষ্ণুর জন্য ব্যাকুল হইতেন, মীরাবাই কেন তাঁহার গোপালকে খুঁজিতে ভূপালকে ছাড়িয়া অতুল রাজঐশ্বর্য্য পায় ঠেলিয়া 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে বৃন্দাবনের দিকে উধাও ভাবে ছুটিলেন তাহা কি সাংসারিক লোক কখন কল্পনায়ও আনিতে পারে? যাঁহাদের ইন্দ্রিয় সংযত চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত তাঁহারা এই জগৎকে ভগবৎবিভূতি ছাড়া আনন্দময়ের লীলাবিলাস ছাড়া আর কিছুই যে মনে করিতে পারেন না। তাঁহাদেরই নিকট যে 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি'। তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি পরি-মার্জ্জিত হওয়ায় অনুভব-শক্তি তীব্র হওয়ায় তাঁহাদের চোখের জ্যোতি মনের গতি কোথাও বাধা না পাইয়া একেবারে অবাধিত ভাবে চলিয়া গিয়া সর্ব্বভূতের মধ্য দিয়া সেই ভূতনাথকে জগতের

ভিতর দিয়া জগন্নাথকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিত। তাঁহাদের মুখেই শুনিতে পাইবে 'যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মাণস্তত্র দর্শনম্'। তাঁহারাই তো 'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ' বলিয়া সব রূপের ভিতর দিয়া সেই অরূপের পায় লুটিয়া পড়েন। ভাগবতের 'খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ' শ্লোকটী স্মরণ কর। সাধকরা কি ভাবে 'স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধ-পানে মধুব্রতানাং মকরন্দ-পানে দানে দয়ালোরথ ভক্তগানে' ভগবানের করুণাময় মূর্ত্তি দর্শন করেন তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা কর। 'যত্রৈব চিত্তে সমুদেতি ভক্তিস্তত্রৈব পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্' এটা শুধু কল্পনা নহে, সাধক মাত্রেরই অনুভূত প্রত্যক্ষীকৃত সত্য। দেখাটাকে রূপটাকে শুধু স্থূলে সীমাবদ্ধ করিয়া সাধক কখনই তৃপ্ত হন না, ইহার সূক্ষ্ম ও কারণ রূপটি ভাবটিই সাধকদের বেশী আনন্দ দান করিয়া থাকে। সাধকেরা বলেন যে বাহিরের স্থূলরূপ হইতে ভিতরের সূক্ষ্মরূপটি আরও উজ্জ্বল আরও মনোজ্ঞ আরও বেশী পরিমাণে চিত্তাকর্ষক, এটা অনুভব করিতে চেষ্টা কর। সাধক একটা গাছের মধ্যে তাঁর অনন্তদেবকে যতটা দেখিতে পান গাছ-টাকে তত দেখিতে পান না, এ কথাও একটু ভাবিয়া দেখিও। আমিও কিন্তু তোমাদের ভিতর দিয়া আমার ভগবানকে যতখানি দেখিতে পাই আস্বাদ করিতে পাই, একটা রক্তমাংসের দেহাবচ্ছিন্ন মানুষকে ততটা দেখিতে বা আস্বাদ করিতে পাই না।

* * *

……কেন তোমরা ভাল করিয়া দেখিতে পাও না, ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পার না, এ কথার আর কি উত্তর দিব? ধনুকের দিকে একটু ভাল করিয়া চাহিয়াছ কি? রশিটীকে যত নিজের দিকে টানিতে পারিবে ততই শরটি শক্তিলাভ করিবে, ভেদ্য পদার্থের ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে। শব্দ-স্পর্শাদিকে কেন কামের পঞ্চশর বলা হইয়াছে তাহা জান কি? ইহারা অসাধকের নিকট কামনা বাসনা আসক্তির পঞ্চশর রূপে পরিণত হইয়া বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করিয়া বিষয়ে আসক্ত বিমোহিত করিয়া ভগবৎলাভে বঞ্চিত করিয়া রাখে; আবার ইহারাই কিন্তু সাধকদের শুদ্ধ চিত্তের ভিতর দিয়া অবাধ গতি লাভ করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া ইহাদের ভিতরকার আত্মা পর্য্যন্ত দর্শন করিবার সুযোগ দিয়া সাধকদের শব্দ-স্পর্শাদির ভিতর দিয়া ভগবৎউপলব্ধির সহায় হয়। যতটা নিজের ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে ততটা পরের ভিতরে দৃশ্যের ভিতরেও প্রবেশ করিতে পারিবে। যে সাধনা দ্বারা নিজের পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে, সে অপরের সব দৃশ্য-পদার্থের পঞ্চকোষ ভেদ

দৃষ্টির গভীরতা

করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিতে আত্মদর্শন করিতে পূর্ণভাবে পূর্ণরূপকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়। দেখিতে জানেন ভগবান, দেখিতে জানেন তাঁর অবতারগণ; তারপরে দেখিতে শিখেন সিদ্ধ মহাতপাগণ, দেখিতে চেষ্টা করেন সাধকগণ; তাইতো ইহাঁদের দ্বারা দৃষ্ট হইয়া আস্বাদ্য হইয়া দৃশ্যগুলিও তাঁহাদের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। দেখিয়াছিলেন একদিন বৃন্দাবনে আমাদের প্রাণের কৃষ্ণচন্দ্র, দেখিয়াছিলেন একদিন তাঁহার প্রাণের রাধারাণী, তাইতো আজও তাঁহাদের সেই দেখার শুনার পাওয়ার ধ্যান দিয়া সিদ্ধ সাধকগণ এইভাবে সমাধিমগ্ন। সেই অবস্থায় দৃশ্যের রূপটি শব্দটি যে কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া দ্রষ্টাকে একেবারে বিভোর করিয়া তোলে—অন্য যাহা কিছু সব ভুলাইয়া দেয়। যদি ভাল করিয়া দেখিতে সাধ থাকে জ্ঞানগঙ্গার জলে প্রেমযমুনার জলে রোজ চোখটিকে ইন্দ্রিয়গুলিকে ধুইতে আরম্ভ কর, এই ধোয়ার ফলে যেন তোমার ভিতরকার দেখিবার সব যন্ত্রগুলি শুদ্ধ হইয়া যায়; তারপরে চেষ্টা কর নিজের ভিতরে প্রবেশ করিতে ভিতরকার সব তত্ত্বগুলি ভেদ করিয়া অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিতে। যত নিজের ভিতরে প্রবেশ করিতে শিখিবে ততই অন্যের ভিতরে প্রবেশলাভ করিবার কৌশল অবগত হইবে। যে নিজেকেই জানে না সে অপরকে জানিবে কি করিয়া? যে নিজেকে দেখে নাই সে অন্যকে দেখিবে কি করিয়া? যে

নিজেকে পায় নাই সে অন্যকে পাইতে পারে না। যদি অন্যকে জানিতে সাধ থাকে, নিজেকে জানিতে চেষ্টা কর। যদি অন্যকে পাইতে সাধ থাকে, নিজেকে পাইতে চেষ্টা কর। যে নিজেকে পাইয়াছে, সে অন্য সকলকে পাইয়াছে—সে যে ভগবানকেও পাইয়াছে। সক্রেটিস বলিতেন, নিজেকে জান—ভগবানকে জানিতে পারিবে "Know thyself and you will know God"; আমরা নিজকে না পাইয়া অপরকে পাইতে যাই তাই তো এইভাবে বঞ্চিত হই। সাধকগণ আগে নিজকে পাইতে চেষ্টা করেন; নিজকে যত বেশী করিয়া পান নিজের ব্যাপী রূপটীকে ততটা দর্শন করিতে সক্ষম হইয়া সর্ব্বগকে সকলের ভিতর দিয়া সকল ভাব ও কাজের ভিতর দিয়া পাইয়া বসেন। আমরা পরকে পাইতে পরকে উপদেশ দিতে যতটা ব্যস্ত হইয়া পড়ি ততটা যদি নিজেকে পাইতে নিজেকে উপদেশ দিতে ব্যস্ত হইতাম, তাহা হইলে পরকে পাইতে পরকে ভালবাসিতে নিজের দেশের জগতের কল্যাণ সাধন করিতে আমাদের আর এতটা বেগ পাইতে হইত না। আমারা যে নিজের দিকে একটু চাহিয়া দেখি না, নিজের চিত্ত শুদ্ধ করিতে নিজের কল্যাণ সাধন করিতে নিজের স্বরূপ দর্শন করিতে একটুও চেষ্টা করি না, তাইতো সব কাজে এত হতাশ হইয়া পড়ি। নিজের মার সেবা না করিয়া যাই জগৎমাতার সেবা করিতে, নিজেকে শোধন করিতে না গিয়া যাই পরকে শোধন করিতে! যে নিজেকে ভালবাসিতে

শেখে নাই সে যে পরকে ভালবাসিতে শিখিবে পরের সুখের জন্য ব্যস্ত হইবে তাহাতো কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

✲ ✲ ✲

প্রাচীন ঋষিদের শিক্ষাপ্রণালী বড়ই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। যে যাহা দেখিত ভাবিত বুঝিত তাহা অবলম্বন করিয়া, সে যাহা চায় যাহা ভাবে তাহাকে তাহার ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া, তাহার সমস্ত কামনা-বাসনার পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিয়া তাহাকে ঋষিদের পূর্ণত্বলাভের ভগবৎসাক্ষাৎকারের যোগ্য শিক্ষাপ্রণালী করিয়া তোলা হইত। তাঁহারা ছিলেন সত্য-বাদী, তাঁহারা থাকিতেন সত্য নিয়া; তাই কতকগুলি কল্পনা-জল্পনার বোঝা জোর করিয়া কাহারও ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইত না। যে যাহা দেখিত সে তাহা অবলম্বন করিয়াই ভাবিতে আরম্ভ করিত, যে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সে সেখান হইতে রওয়ানা হইতে শিক্ষা পাইত। তাই তাঁহাদের কথা ভাব ও কাজের মধ্যে বেশ একটা সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যাইত। ছাত্র গুরুর কাছে ব্রহ্মতত্ত্ব শিখিতে গিয়াছে। সে বলিল, আমি হলদে রংএর একটা দেওয়াল দেখিতেছি। আসলে দেওয়ালটা

ছিল সাদা, শিষ্যের হইয়াছিল কামলা রোগ, তাই সে ঐ ভাবে দেখিয়াছে ঐরূপ বলিয়াছে। গুরু তখন তাহার অনুভূতিতে বাধা না দিয়া তাহারই ধারণার অনুকূল ভাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, তুমি ঐ দেওয়ালটির ধ্যান করিতে থাক উহার পূজা কর উহাকে ঠিক ভাবে জানিতে বুঝিতে চেষ্টা কর, উহার উপাসনা কর উহার সম্মুখে সান্নিধ্যে বাস করিতে আরম্ভ কর। শিষ্য তখন দেওয়ালে মনোনিবেশ করিয়া দেওয়ালের তত্ত্ব জানিতে তৎপর হইয়া পড়িল। কিছু দিনের মধ্যে আশ্রমের সৎসঙ্গের বিশুদ্ধ হাওয়ায় বিধিনিষেধের শৃঙ্খলার ফলে শিষ্যের কামলা রোগ দূর হইয়া গেল। সে তখন নিজ হইতেই বলিতে আরম্ভ করিল, গুরুদেব! দেওয়ালটি হলদে নয়—সাদা। তখন আবার গুরু তাহাকে সাদা দেওয়ালের ভিতরকার তত্ত্বে মনোনিবেশ করিতে উপদেশ দিলেন। আস্তে আস্তে শিষ্যের ধারণা-শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুভব-শক্তিও বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে সে দেওয়ালের বাহির-ভিতরের সব তত্ত্ব অবগত হইয়া পরম জ্ঞান লাভ করিল। সে যখন দেওয়ালকে হলদে বলিয়া মনে করিয়াছিল তখন গুরু যদি তাহাকে জোর করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতে যাইতেন যে দেওয়াল সাদা, তবে তাঁহার সেই সৎশিক্ষা অসৎভাবে গৃহীত হইয়া তাহার অনুভবের সহায় না হইয়া একটা অস্বাভাবিক বোঝায় পরিণত হইয়া তাহার বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিত। যাহা প্রাণ হইতে

বুঝিতে পারা যায় না, যাহা বুঝিয়া নিজের করিয়া লওয়া যায় না, তাহা বাধ্য হইয়া বিশ্বাস করিতে গিয়া আমরা অস্বাভাবিক ভাবে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ি। পরে সেই বোঝা আমরা যে পর্য্যন্ত আমাদের ঘাড় হইতে দূর করিতে না পারি, সে পর্য্যন্ত আমরা কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করি! এইজাতীয় শিক্ষা কখনও স্বাভাবিক হয় না।

উপনিষদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে দেখিতে পাই, গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন 'বৎস কি দেখিতে পাইতেছ?' শিষ্য বলিলেন 'এই গাছ পাতা আকাশ মানুষ গরু'। শিষ্যের দৃষ্টি তখন শুধু অন্নময়ে সীমাবদ্ধ দেখিয়া গুরু বলিলেন 'অন্নময়-ব্রহ্মের উপাসনা করিতে থাক' অর্থাৎ জগতের অন্নময় কোষটাকে একটু ভাল ভাবে দেখিতে আরম্ভ কর, একটু তাহার কাছে গিয়া তাহার কাছে বসিয়া তাহার সেবা করিয়া তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা কর। শিষ্য অন্নময় কোষ অবলম্বনে সাধন করিতে করিতে অন্নময়ের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়া বলিয়া বসিল 'গুরুদেব! এই অন্নময় কোষের দেহটি, ইহার ভিতরে প্রাণময় কোষটি বর্ত্তমান না থাকিলে এ যে কোনও কাজই করিতে পারে না; এমন কি, বাঁচিয়া থাকিতে পর্য্যন্ত অসমর্থ হইয়া পচিয়া গলিয়া নষ্ট হইয়া যায়; আমরা যে প্রাণের অভাবে আমাদের এই প্রিয় দেহটিকে আগুনে পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিতে বাধ্য হই। সুতরাং

প্রাণময়ের দিকেই তো আমাদের বেশী দৃষ্টি থাকা দরকার'। গুরুও তখন বলিয়া দিলেন 'প্রাণময় ব্রহ্মের উপাসনা কর'। এইভাবে প্রাণময়ের উপাসনা করিতে গিয়া কাছে বসিতে গিয়া প্রাণের স্বরূপ অবগত হইয়া প্রাণময় ভাবে ভাবিত হইয়া প্রাণের শান্ত ভাব প্রতিষ্ঠার ফলে শিষ্যের তখন মনোময় কোষের দিকে দৃষ্টি পড়িল। এইভাবে এক এক কোষের সাধনা করিতে গিয়া সেই সেই কোষের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া পর-কোষের তত্ত্বাবধারণে সামর্থ্য জন্মিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি অগ্রসর হইতে থাকায় আমরা আপনা হইতে উপরের তত্ত্ব উপলব্ধির সুযোগ লাভ করিয়া থাকি। এইভাবে সব তত্ত্ব ভেদ করিয়া শিষ্য যখন ব্রহ্মতত্ত্বে গিয়া উপস্থিত হন, গুরু তখন দেখাইয়া দেন যে সেই ব্রহ্মতত্ত্বই কি ভাবে সর্ব্বতত্ত্বে অনুস্যূত অনুপ্রবিষ্ট—কি করিয়া সব তত্ত্বে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিতে হয়। শিষ্যও তখন প্রতি তত্ত্বে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া গুরুর সকল উপদেশ যে সত্য অভ্রান্ত তাহা উপলব্ধি করিয়া জীবন সার্থক করিয়া তোলে। হয়তো এই ভাবে উপদেশ মত চলিয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিতে অনেক সময় লাগিয়া গেল, কিন্তু ইহার ফলে শিষ্য যে শিক্ষা লাভ করিল তাহা পূর্ণরূপে সফল হইয়া শিষ্যের জীবন ধন্য করিয়া দিল। আজকালকার শিষ্যের মধ্যে অনুভূতির কোনও সম্বন্ধই থাকে না। আমরা শুধু পাখীর মত কতকগুলি বুলি মুখস্থ

করিয়া যাই, প্রকৃত পক্ষে একটি তত্ত্ব সম্বন্ধেও আমাদের কোনরূপ অনুভূতি জন্মে না। সুতরাং এসব শিক্ষা আমাদিগকে শুধু গর্দ্দভের মত ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে, ইহা আমাদের জীবনগঠনে উন্নতিসাধনে আনন্দপ্রাপ্তিতে পূর্ণতালাভে ভগবৎউপলব্ধিতে কোনও সাহায্য করিতে পারে না। এইজাতীয় শিক্ষার ভারে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত গর্দ্দভগুলি একান্ত ভাবে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বঙ্কিম চন্দ্রের মতে যখন বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী ইহাদের মস্তক হইতে বোঝা নামাইয়া লন, তখন ইহাঁরা আবার সদলে মিশিয়া ঘাস খাইতে আরম্ভ করেন! যাহা শিখিলাম তাহা যদি কাজে লাগাইয়া জীবনগঠনের কল্যাণসাধনের আনন্দলাভের সহায় করিয়া তুলিতে না পারিলাম, তবে তাহা যে একান্তই ভাররূপে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিবে। আজকাল যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতে আইসে যে, কাজ কে করে —ভগবান কি আমি? তবে আমি দু'ঘণ্টায় তাহাকে সব বেদ-বেদান্ত উপনিষদাদির সার তত্ত্ব বুঝাইয়া একজন পণ্ডিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব; কিন্তু কাজের বেলা দেখিব যে আমার এত পরিশ্রম তাহার এতটা সময়নাশ, তাহার ও আমার কোনই কল্যাণসাধনে সক্ষম হয় নাই। প্রাচীন কালের শিক্ষা-প্রণালী কিছু অন্য রকমের ছিল। তখন শিষ্য যেই জিজ্ঞাসা করিত, কে করে? গুরু অমনি জিজ্ঞাসা করিতেন, কে

আসিয়াছে কে বলিতেছে কে কথা বলে ?—ইত্যাদি। শিষ্য তখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইত যে, সে-ই চলে বলে আর কর্ম্ম করে। তখন গুরু বলিতেন, তুমিই যখন এসব কর তখন তোমার সব কাজ খুব ভালভাবে করিতে চেষ্টা কর ; এমন ভাবে কর যাহাতে তোমার কাজ তোমার ও অপর সকলের কল্যাণের কারণ হয় তোমাকে পূর্ণতালাভে ভগবৎপ্রাপ্তিতে সাহায্য করে। তুমি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছ তাহাই ভাল ভাবে করিতে চেষ্টা কর। শিষ্য তখন গুরুর এই উপদেশকে নিজের সম্পত্তি করিয়া তুলিয়া তদনুসারে চলিতে আপনা হইতেই উৎসাহিত হইয়া পড়িত।

আজকালকার গুরুদেবরা শিষ্যকে এমন কতগুলি উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন যাহা শিষ্যদের বোঝা তো অসম্ভব, গুরু স্বয়ংই বুঝিয়াছেন কি না সন্দেহ! সংসার অসার, সংসার বন্ধনের কারণ, একমাত্র ভগবানই সার বস্তু। বলা বাহুল্য ঐ সব গুরুদেবদের কিন্তু সংসারের এই সব অসার জিনিস না হইলে একদিনও চলে না, ইহাদের উপরে তাঁহাদের বিশেষ আসক্তি রহিয়াছে। এসব বৈরাগ্যের কথা ভগবানের কথা তাঁহাদের অনুভূত সত্য নহে,—শুধু পাখীর ন্যায় মুখস্থ করা কতকগুলি শব্দ মাত্র। ইহারা যেমন গুরুর জীবনগঠনে অসমর্থ ছিল, শিষ্যের জীবনগঠনেও তদ্রূপ অসমর্থই থাকিয়া গেল। ব্যবসা চলিতে লাগিল—জীবনটা একপদও অগ্রসর হইতে সমর্থ

হইল না। উন্নতি ভগবৎপ্রাপ্তি শুধু কথার কথায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িল। এজন্য আমরা গীতায় দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্য ও সখা অর্জ্জুনকে সর্ব্বপ্রথমে সাত্বিক ভাবে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এখান হইতে শিষ্যের কর্ম্মযোগের সাধন আরম্ভ হইল। আসক্তি-বর্জিত হইয়া ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে শিষ্য আস্তে আস্তে কর্ম্ম-তত্ত্বের স্বরূপদর্শনে সক্ষম হইতে আরম্ভ করিল। তখন কর্ম্ম হইল তাহার উপাস্য দেবতা। কর্ম্মের উপাসনায় ফলে কে যে কর্ম্ম করে তাহার স্বরূপ অনেকটা সে প্রত্যক্ষ করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বে ভাবিয়া ছিল অহংকারই সব কর্ম্ম করে ; এখন অহং-তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হওয়ার ফলে সে বুঝিতে পারিল, অহং-তত্ত্বটা প্রকৃতিরই একটা অংশ বা তত্ত্ব মাত্র। ব্যষ্টিপ্রকৃতি সমষ্টি-প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। সমষ্টি-প্রকৃতির কার্য্য-বিশেষে অজ্ঞানবশে আমিত্ব স্থাপন করিয়া সে এত দিন নিজেকে কর্ত্তা মনে করিয়াছিল। জলের বিম্ব জলেরই তালে তালে চলিয়া জলের কর্ম্ম পালন করে, জলেরই ইচ্ছা পূর্ণ করে। এই যে আমরা আম খাই, ইহার মধ্যে কেন আমের বীজে আম গাছ হয় কেন তাহাতে ফল ধরে কেন সেই ফল পাকে তাহার উপর আমাদের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই—কর্ত্তৃত্ব শুধু হাত দিয়া মুখে তুলিয়া দেওয়ায় ; তার পরে আমাদের এই দেহ এই হাত এই মনের প্রবৃত্তি—ইহারাও যে সেই প্রকৃতিরই অংশ ; আবার কেন যে

আঁম পেটের মধ্যে গিয়া হজম হইল, রক্তে পরিণত হইল, তাহারও উপর যে আমাদের কোনও হাত নাই। যেখানে প্রকৃতিই সব করেন প্রকৃতিই আমাদের সব কল্যাণসাধনে এত তৎপর, সেখানে শুধু অজ্ঞানবশে অহংকার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া নিজেকে কর্ত্তা ভাবিয়া কেন আমরা বিড়ম্বিত হইতে বসি! তাই তখন আমরা বলিতে আরম্ভ করি যে প্রকৃতিই সব করান; আমরা কাজ করি না, কাজগুলি আমাদের ভিতর দিয়া কৃত হইয়া যায় এই মাত্র। তখনকার জন্যই শাস্ত্র বলেন 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ' 'গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে'। এই অনুভূতি-লাভের ফলে আমরা মা প্রকৃতির উপর সমস্ত কর্ম্মের ভার ছাড়িয়া দিয়া 'যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়াইবার' সুযোগ লাভ করিয়া উদাসীন-ভাবে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইতে শিক্ষা পাই। এইভাবে সাধনের পরাকাষ্ঠা অবস্থা—প্রকৃতির উপাসনার প্রভাবে প্রকৃতির সান্নিধ্য-লাভের ফলে প্রকৃতির অন্তরাত্মা যে পুরুষ-চৈতন্য আমরা তাঁহার পরিচয় পাইতে আরম্ভ করি। তখন আস্তে আস্তে অনুভব করিতে আরম্ভ করি যে, প্রকৃতি পুরুষেরই প্রকৃতি—তাঁহারই আদেশপালনে নিযুক্ত; পুরুষেরই সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ প্রকৃতির ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতির প্রতিস্তরে অনুস্যূত থাকিয়া প্রকৃতিকে ভগবৎইচ্ছা-পূরণে ভগবৎআদেশপালনে নিযুক্ত করিয়াছে। তখনই আমরা প্রকৃতির তালে তালে মিলিয়া

প্রকৃতি যে ভাবে পরম পুরুষের সেবা করেন পূজা করেন আরাধনা করেন, আমরাও সেই ভাবে তাঁহার সেবা পূজা আরাধনা করিয়া জীবন সার্থক করিতে যাই। প্রকৃতি করেন পরমাত্মার সেবা, আমরা হই প্রকৃতির পূজার সহায়; সুতরাং আমরাও করি একটু পরোক্ষভাবে সেই পরমাত্মারই পূজা। বৈষ্ণব সাধকগণ রাধাতত্ত্ব সখীতত্ত্বের মধ্য দিয়া এই ভাবটি ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাধারাণীই করেন তাঁহার প্রাণগোবিন্দের আরাধনা, মনোবৃত্তি-রূপ কায়ব্যূহ স্বরূপ সখীগণ হন রাধারাণীর সেই সেবার সহায়। মঞ্জরীগণ প্রাণময় কোষে বসিয়া সেই মনোময় জ্ঞানময় কোষে অবস্থিত সখীগণের সেবার সহায় হন।

আসল কথা, এই ভাবে পরমাত্মার উত্তম পুরুষের কতকটা স্বরূপ অবগত হইয়া সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবাত্মা নিজের সমস্ত কল্পিত কর্তৃত্বাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া আত্মনিবেদন-তত্ত্বের মধ্য দিয়া ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবার সুযোগ পান। এত দিন যে ভক্তিপুষ্পটিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যে অহংতত্ত্বের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই অহংকার আজ সেই ভক্তিপুষ্পটিকে পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া আপন জীবন সার্থক করিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া পড়িল। অহংতত্ত্বের উৎপত্তি, বিদ্রোহ ও পরিণতি শুধু আত্মনিবেদন-তত্ত্বকে সার্থক করিবার জন্য। জীবের কর্তৃত্বাভিমানটি

শুধু প্রকৃত কর্ত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া নকল কর্ত্তার অভিমান দূর করিয়া সমস্ত কল্পিত কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিবার জন্য। ছেলে মাকে ছাড়িয়া মার কোল হইতে দূরে যায় শুধু মাকে খুব ভাল করিয়া পাইবার জন্য। ভগবানের জগৎসৃষ্টি জীবের এই বহির্মুখপ্রবৃত্তি শুধু লয়-যোগকে অন্তর্মুখী ভাবকে সার্থক করিয়া ভিতর-বাহিরের একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া পূর্ণতালাভের জন্য। ভগবান জগৎসৃষ্টি করেন শুধু নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য; তাঁহার তামসিক প্রকৃতি যে তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখে, তাহাও তাঁহাকে আস্তে আস্তে আমাদের ধারণার উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য। এই যে ফুলের কুঁড়ির পাতাগুলি ফুলকে ঢাকিয়া রাখে, ইহাও যে ফুলটিকে উপযুক্ত সময় ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য। প্রাচীন কালের শিক্ষাপ্রণালী অনুষ্ঠিত হইত আস্তে আস্তে—সাধনের তালে তালে। সব খাদ্যগুলি যাহাতে ভাল করিয়া হজম হইয়া আমাদের পরিণতির সহায় হইতে পারে সেদিকে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। এখনকার শিক্ষার সঙ্গে অনুভূতির সাধন-ভজনের জীবনগঠনের কোনও সম্বন্ধ থাকে না। শিক্ষাটা চলিয়া যায় অনেক দূর আগে, আমরা পড়িয়া থাকি অনেকটা পিছনে। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জীবনটারও যে অগ্রসর হওয়া দরকার তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়া আমরা এখন কথায় পণ্ডিত ভাবে নাস্তিক কাজে একটী অসার অপদার্থ হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি।

কাল মোটর গাড়ীতে শিমলা যাচ্ছিলাম, রাস্তায় ততটা আরাম পাচ্ছিলাম না। কেবল মনে হচ্ছিল, কখন পৌঁছিব—আর কতটা বাকী? মোটরের ঝাঁকিতে একবার কতকটা বমিও হয়ে গেল। রাত্রিতে ইহার কারণটা বেশ সুন্দর ভাবে বুঝিতে পারা গেল। ফলের দিকে ভবিষ্যতের দিকে ভবিষ্যতের ভোগ্য বিষয়ে বেশী লক্ষ্য থাকায় আমরা বর্ত্তমানকে ভোগ করিতে সক্ষম হই না। এইভাবে আমরা কতটা যে বঞ্চিত হই, তাহাও বুঝিবার আমরা অবকাশ পাই না। ভবিষ্যতের আশা বর্ত্তমান সম্বন্ধে, বর্ত্তমানে ভোগ্যরূপে উপস্থিত বস্তু সম্বন্ধে আমাদিগকে এতটা উদাসীন করিয়া দেয় যে আমরা সেদিকে একবারও চাহিয়া দেখি না, সে সম্বন্ধে একবারও ভাবিতে যাই না। গন্তব্য-স্থানে বেশী দৃষ্টি বলিয়া রাস্তার দৃশ্যাদি উপলব্ধি করিতে অপ্রস্তুত থাকায় দূরে রেলগাড়ীতে কোথাও যাওয়া আমাদের নিকট এতটা কষ্টকর হইয়া পড়ে। প্রয়োজনের তাগিদায় গন্তব্য স্থানে শীঘ্র শীঘ্র পৌঁছিবার আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্যের দিকে সমস্ত প্রাণটা পড়িয়া থাকায় রাস্তায় আর কিছুই ভাল

বর্ত্তমানেষু
বর্ত্তেত

লাগে না, কিছুই যে আর ভোগ করা যায় না; ফলে অত্যাসক্তিই আমাদিগকে এইভাবে সমস্ত ভোগ হইতে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়। রাস্তার দৃশ্যগুলি লোকগুলি কিছু কম দেখিবার ভোগ করিবার জিনিস নয়; সেদিকে অল্পও লক্ষ্য থাকিলে রাস্তার কষ্টটা এত বিচলিত করিত না। কাহারও সঙ্গে দেখা করার মূল্য এত বেশী হইয়া পড়ে যে তখনকার বর্ত্তমান ভোগ্য পদার্থ আমাদিগকে তৃপ্তি দিয়া ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হয় না। সেখানে যেন না গেলেই তখন চলে না। এইজন্য বোধ হয় 'বর্ত্তমানেষু বর্ত্তেত' বলিয়া সাধকদিগকে বর্ত্তমানের প্রতি বেশী দৃষ্টি রাখিতে বলা হইয়াছে। যতই সুখকর হউক ভবিষ্যতে নির্ভর রাখিও না—**Trust no future however pleasant** এ কথার সাক্ষ্য দেয়। যে নিত্যতৃপ্ত তাহার সব বিষয়েই তৃপ্তি। তৃপ্তির মূল প্রস্রবণ যার নিজের ভিতরে তার উপকরণ সর্ব্বত্র বিস্তৃত। আকাশের শোভা গাছের শোভা, মানুষের শোভা হইতে কম কে বলিবে? তৃপ্তির অভাবই ছুটাছুটিতে প্রবৃত্তি দেয়। মানুষ নিজের অবস্থায় তৃপ্তি পায় না—**Man never is but always to be blest**; তাই তৃপ্তির খোঁজে বাহির হয়, উপকরণসংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হয়। যাহা তৃপ্তিকর বলিয়া একবার ঠিক করিয়া লয় তাহার পিছনে একেবারে মুগ্ধ হইয়া ধাবিত হয়। তখন অন্ধ আর কি করিয়া পথের জিনিস দর্শন করিবে? আনন্দের রাস্তা

আনন্দের দাতা যে নিজের ভিতরে তাহা একবারও ভাবিয়া দেখে না।

শিমলা—১৫।৫।২৬

✾ ✾ ✾

আমরা যাহা করি যাহা ভাবি সব যেন চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা হইয়া যায়। চিত্রগুপ্ত যে আকাশ-তত্ত্বের অধিপতি যমরাজার প্রধান মন্ত্রী। তিনি আকাশ-তত্ত্বে গুপ্তভাবে সাধারণ মানুষের অগোচরে থাকিয়া সব সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়া রাখেন। গ্রামোফনের গানগুলি যেমন প্লেটে ধরিয়া রাখা হয়

সূক্ষ্ম দর্শন

সেইরূপ আমাদের সব কাজ ও ভাবের প্রতিচ্ছবি (impression) প্রকৃতির গায় লেখা হইয়া যায়। যাঁহাদের ভিতরকার তত্ত্বগুলি সব খুলিয়া গিয়াছে, যাঁহারা প্রকৃতি-গ্রন্থ উত্তমরূপে পড়িতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা এসব তত্ত্ব বেশ সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। ঋষিরা কোনও পাথর দেখিয়া বলিতে পারিতেন, সেই পাথরের উপর কত বৎসর পূর্ব্বে কোন্ মহাত্মা কি ভাবে তপস্যা করিয়া গিয়াছেন; কোনও গাছতলায় বসিয়া বলিতে পারিতেন সেখানে কবে কে কি ভাবে বসিয়া কিরূপ সাধন-ভজন করিয়া গিয়াছেন।

ঐ সব জায়গার প্রতি পরমাণু যে সে সব মহাত্মাদের স্মৃতি বুকে ধারণ করিয়া আপনাকে পরম গৌরবান্বিত মনে করে। ঐ সব জায়গার প্রতি পরমাণুতে যে তাঁহাদের সমস্ত সাধন-ভজনের গূঢ় রহস্য অঙ্কিত রহিয়া গিয়াছে। যাঁহারা এ সব তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা ঐ সব স্থানকে পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া সম্মান করেন। এই যে স্থানবিশেষে বিশেষভাবে একএকটা আকর্ষণ অনুভব করা যায়, তাহার মূলেও এই তত্ত্বই নিহিত। সাধকদের সাধনপ্রণালী সাধনরহস্য (Spiritual Magnetism) সেখানকার ভূমিতে প্রকৃতি কর্তৃক অতি যত্নে রক্ষিত হয়। যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত তাঁহারাই সে সব স্থানের ওসব অলৌকিক শক্তি (magnetism) দ্বারা সহজে আকৃষ্ট হন। জঙ্গলের মধ্যে মাটি চাপা গুহা ও মন্দির অনেক সাধক এই ভাবে আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের সাহায্যে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক গূঢ় রহস্য অতি সহজে আবিষ্কৃত হইতে পারে। বুদ্ধের সাধনক্ষেত্রে গিয়া বুদ্ধের সাধনপ্রভাব তাঁহার সাধনরহস্যের যাবতীয় স্মৃতি অনুভব করা ইঁহাদের পক্ষে তত কঠিন হয় না। কোনও প্রস্তরবিশেষের উপর বসিয়া তাঁহারা জোর করিয়াও বলিতে পারেন যে এই পাথরের উপরে অমুক সময় ভগবান বুদ্ধ সমাধিমগ্ন হইয়া অমুক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।...আমাদের চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হইলে তাহাতে সব তত্ত্বের প্রকৃত রহস্য প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে।

ঐ ভাবের সাধকের মনে যাহা হইবে তাহা সত্য হইতে বাধ্য। মিথ্যা ভাব তাঁহাদের মনে থাকিতে পারে না, মিথ্যা কথা তাঁহাদের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না। কোনও রোগী দূরে থাকিলে তাহাকে চোখে না দেখিয়া তাহার বিষয়ে কিছু না শুনিয়া তাহার রোগের সব অবস্থা সাধকরা অতি সহজে বুঝিতে পারেন। রোগীর সব চিত্র সাধকদের স্বচ্ছ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাদের মনে তদনুকূল ভাবের সৃষ্টি করে, পরে মনের ভিতর দিয়া কথার ভিতর দিয়া সেই ভাব বাহিরে ফুটিয়া বাহির হয়। যাহাদের ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে, চিত্ত শুদ্ধ শান্ত কামনা-বাসনাসংস্কার-বর্জ্জিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট এই অবস্থা যে সহজে স্বাভাবিক ভাবে আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রাচীন ভারতে এই ভাবে সাধকদের নিকট দূর-শ্রবণ দূর-দর্শন পরচিত্ত-বিজ্ঞান আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইত। আজকাল অনেকে এই সব শক্তি লাভ করিবার জন্য অনেকরূপ অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। প্রকৃতি—মা আদ্যাশক্তি, তাঁহার উপযুক্ত সন্তানকে তাঁহার ভাণ্ডারের সমস্ত রত্নরাজী সমস্ত গূঢ় রহস্য দেখাইবার জন্য জানাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল; কিন্তু আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ কুসন্তান যে একবারও মার দিকে ফিরিয়া চাই না, কামনা বাসনা আসক্তি দ্বারা এমন সীমাবদ্ধ যে মার আমাদের কাছে আসিবার রাস্তা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাই আমাদের কথা

ভাব ও কাজ—সবই মাতৃদর্শনের মাতৃ-অনুভূতির পরম বাধা জন্মাইয়া থাকে। তিনি তো সাহায্য করিতে সর্ব্বদা ব্যাকুল, আমরা তাঁহাকে সাহায্য করিবার সুযোগ দেই কোথায়? আমরা দ্বার খুলিয়া না রাখিলে তাঁহার জ্ঞানসূর্য্যের কিরণ প্রেমজ্যোৎস্নার লাবণ্য যে আমাদের ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না।

* * *

বোঝা ও হাল্কা

আমাদের দেখাটা জানাটা পাওয়াটা যাহাতে একটা বোঝায় পরিণত না হইয়া আমাদের জীবনগঠনের কর্ত্তব্যসাধনের সহায় হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যেটা আমরা গ্রহণ করি বহন করি পরের ইচ্ছায়, যাহা আমাদের ব্যবহারিক বা পারমার্থিক জীবনে কোনও কাজেই আইসে না, তাহাই আমাদের নিকট একটা অসহ্য বোঝায় পরিণত হইয়া আমাদের কষ্টের কারণ হইয়া পড়ে। যেটা আমাদের কাজে আসে, উন্নতির আনন্দের সহায় হয়, স্বরূপতঃ ভারী হইলেও সে ভারে আমরা অস্থির না হইয়া বরং আনন্দই অনুভব করিয়া থাকি। এমন ভাবে দেখা চাই, যাহাতে আমাদের দেখাটা জানাটা পাওয়াটা একটা বোঝায় পরিণত না হইয়া আনন্দের সহায় হয়। যাহা উপরে

আইসে কতকটা ভিতরেও যায় তাহা ভালরূপ হজম না হইলে আপনার না হইলে, আমাদের জীবনগত প্রাণগত ভাবগত না হইলে যে একটা বদ হজম তৈয়ার করিয়া বসিবে। রসগোল্লা সন্দেশ আদি পেটুকের নিকট খুব প্রিয় হইলেও তাহার বোঝা বেশী ভারী হইলে সব সময় বহন করা পেটুকের পক্ষেও যে তত সহজ মনে হয় না। তাহা পেটে গেলে বোঝাটা একটু কমে, হজম হয়ে রক্ত হয়ে দেহে পরিণত হইয়া আপনার হইয়া গেলে তখন আর তাহা বোঝা মনে হইয়া কষ্ট দেয় না, বরং বল-বিধান করিয়া আনন্দের সহায় হয়। যে বা যাহা যতটা আপনার হয় তাহার ভারটাও তত কমিতে থাকে। একেবারে আপনার হইয়া গেলে আত্মার হইয়া গেলে আত্মায় পরমাত্মায় পরিণত হইতে পারিলে তখন তাহা মুক্তির আনন্দের সহায় হইয়া পড়ে। এজন্য আমরা যাহা কিছু দেখিব যাহা কিছু জানিব যাহা কিছু পাইব, তাহা আপনার করিয়া লইয়া আপনার আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারে লাগাইয়া আমাদের দেখা ও পাওয়াটাকে সার্থক করিয়া তুলিব। যে কৃপণ যে উপার্জ্জিত বা প্রাপ্ত অর্থকে নিজের কাজে আত্মীয়স্বজনের দেশের সেবায় আনন্দ-বিধানে লাগাইতে সক্ষম না হয়, সে যে কি ভাবে উক্ত অর্থের ভারে অর্থের চিন্তায় অস্থির ব্যাকুল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা বোধ হয় অনেক সময় ভাবিয়া দেখিবারও সুযোগ পায় না। অর্থ যে আস্তে আস্তে তাহার না হইয়া তাহাকেই বরং

অর্থের করিয়া তোলে, তাহার বিকৃত মস্তক তাহা পর্য্যন্ত তাহাকে বুঝিতে দেয় না। আমরা দেখাটা জানাটা পাওয়াটাকে আপনার করিয়া তুলিয়া আমাদের কাজে লাগাইয়া আমাদের জ্ঞানের আনন্দের সহায় করিয়া তুলিব। দেখাটা পাওয়াটা কাজটা কখন্ আনন্দ দান করে, আনন্দের সহায় হয়? মনে রাখিতে হইবে, যে যত প্রিয় যে যত আত্মীয় তাহাকে দেখা পাওয়া তাহার সেবা করা তাহার জন্য কাজ করা তত কষ্টকর বা শ্রমসাধ্য না হইয়া বরং আনন্দপ্রদই হইয়া থাকে। সাধক ভক্ত সর্ব্বত্র তাঁহাদের প্রিয়তমের অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া অস্তিত্ব অনুভব করিয়া তাঁহাদের দেখা ভাবা পাওয়া ও সেবা করাকে এতটা সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক করিয়া তোলেন। দেখাটা যত তীব্র হইয়া দিব্য-দর্শনটা যত খুলিয়া যাইবে, ততই সর্ব্বভূতে প্রিয়তমের দর্শন ও অনুভূতি তীব্রতর ও মধুরতর হইয়া আমাদের দর্শন-কার্য্যকে সফল ও আনন্দপ্রদ করিয়া তুলিবে। তাই শাস্ত্র বলেন, দেখতে হয়তো একটু ভাল ক'রে দেখ পেতে হয়তো একটু ভাল করে পাও, অল্পে তৃপ্ত হইও না—'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। ভূমাকে অনন্তকে পূর্ণকে পূর্ণভাবে না পাইলে কিছুতেই পূর্ণানন্দলাভের সম্ভাবনা নাই।

———

স্বরূপ ও লীলা

ভারতের প্রাচীন ঋষিরা জগতের সকল ঋষিরা প্রায় এক ভাবেই দেখেন। ভগবানের প্রকাশ পাইবার প্রণালী যে ভাবের ঋষিগণ ঠিক যেন তাহার উল্টাভাবে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান প্রথম ছিলেন গুণাতীতভাবে স্বরূপে, প্রকাশ পাইলেন কারণ-শরীরে তারপর সূক্ষ্মে সব শেষে স্থূল শরীরে স্থূল জগতে। এখন সর্ব্বত্র অনুস্যূত অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য সন্দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্থূলে অভিব্যক্তি যেন অনেকটা সর্ব্বশেষে—ঋষিরা তাই দেখিতে আরম্ভ করিলেন প্রথমে স্থূলে পরে সূক্ষ্মে তারপরে কারণে সর্ব্বশেষে তুরীয়ে। তাঁহা-দের প্রথম দেখাটা আরম্ভ হইল স্থূল নিয়া, ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া; অন্নময়ের দর্শন চলিতে লাগিল। সেই দেখা পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মদর্শন—প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের দর্শন আস্তে আস্তে খুলিয়া

বাহির হইতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বশেষে তাঁহাদের দর্শনটা ভগবৎ-দর্শনে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা স্বরূপস্থ হইয়া সর্ব্বত্র আত্মদর্শনে পরমাত্ম-দর্শনে অধিকার লাভ করিয়া বসিলেন। ভগবানকে স্বরূপে দেখিয়া ভগবানকে স্বরূপে পাইয়া আবার লীলায় পাইবার জন্য তাঁহাদের মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল; কারণ আসল তত্ত্ব তো শুধু স্বরূপে সীমাবদ্ধ নহে, স্বরূপ ও লীলা উভয় ভাব লইয়াই যে ভগবৎতত্ত্ব। তখন তাঁহারা আবার উপর হইতে ভগবানকে নিয়া আসিতে আরম্ভ করিলেন, প্রতিতত্ত্বে তাঁহাকে দর্শন করিয়া আস্বাদ করিয়া সর্ব্বত্র তঁহার লীলারসে বিভোর হইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরাকার ভাবে গিয়া স্বরূপদর্শন করার পরে সগুণ সক্রিয় সাকার ভাবের মধ্য দিয়া তাঁহার লীলাদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাচীন ঋষিদের দর্শনক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করিত না। সাধনরাজ্যেও একবার তাঁহারা 'নেতি' 'নেতি' করিয়া উপরে উঠিয়া 'ইতি'কে দেখিয়া সেই 'ইতি'র খেলাই সর্ব্বত্র অনুভব করিয়া দেখার কাজটা পূর্ণ করিয়া লইতেন।

হে ভগবান আমরা যে একান্তভাবে স্থূল জগতে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি! তাহাও অসম্পূর্ণভাবে—তোমাকে বাদ দিয়া। আমাদের এই দৃষ্টি বাহির হইতে একটু ভিতরের দিকে তোমার আনন্দধামের দিকে সরাইয়া দাও; তোমার আকর্ষণটাই যেন প্রবল হইয়া আমাদের মনটাকে ভিতরের দিকে টানিয়া লয়,

আমরা যেন সংযমের ভিতর দিয়া বৈরাগ্যের ভিতরে দিয়া তোমার বিধান মতে চলিয়া তোমার প্রদত্ত অন্তর-ও-বহিরিন্দ্রিয়-গুলিকে অন্তর্মুখী করিয়া তোমার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিতে সক্ষম হই। যে একবার তোমার আস্বাদ পাইয়াছে তাহার মন যে আর অন্যদিকে যাইতে চায় না, তোমার প্রেম তোমার টান তোমার আহ্বান যে তার সব আসক্তি দূর করিয়া তোমার করিয়া লয়। ভিতরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া আমরা যেন তোমার আনন্দধামে বিলাস-ভবনে গিয়া তোমার স্বরূপটি আনন্দঘন-রূপটী দর্শন করিয়া আমাদের জীবন সার্থক করিবার সুযোগ পাই। তার পরে তোমাকে লইয়া আমাদের ভিতর-বাহিরের সব তত্ত্ব-গুলিতে তোমাকে দর্শন করিয়া আস্বাদ করিয়া আমরা যেন সর্ব্বত্র তোমার লীলারস আস্বাদ করিবার যোগ্যতা লাভ করি। তুমি নিজে না দেখাইলে নাকি কেহ তোমাকে দেখিতে পায় না, তুমি নিজে না ডাকিলে কেহ নাকি তোমার কাছে যাইতে পারে না, তুমি নিজে প্রকাশ না পাইলে কেহ নাকি তোমাকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা বুঝি, আর না বুঝি আমরা তো তোমারই। তুমি তো আমাদিগকে তোমার কাছে লইয়া গিয়া তোমার আনন্দসাগরে ডুবাইয়া রাখিতে ইচ্ছুক। হে রুদ্র, তুমি আমাদের বদ্ধ দুয়ার জোর করিয়া খুলিয়া দাও, যেন তোমার অবাধ আলো-বাতাসে আমরা বিচলিত না হই। তোমার মঙ্গলময় আঘাত বুঝিতে না পারিয়া আমরা হতাশ হইয়া পড়ি,

এজন্য তোমার রুদ্ররূপের মধ্যে তোমার দক্ষিণ-মুখ প্রসন্ন-মুখ তোমার স্নেহমাখা প্রেমভরা মুখখানি সর্ব্বদা যেন আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত থাকে। হে আবিঃ! তুমি আমাদের ভিতর দিয়া জগতের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাও, আমাদের দেখার পাওয়ার আস্বাদনের সহায় হও; আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর আমাদের জীবন সার্থক কর, তোমার সৃষ্টির ইচ্ছা বহু হইবার সঙ্কল্প সফল কর।

প্রকৃতি কাজ করেন কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকেন। কারণ প্রকৃতি-শব্দ ‘কৃ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, কৃ ধাতুর অর্থ করা;

প্রকৃতি-পুরুষ

যিনি প্রকৃষ্টরূপে করেন প্রকৃষ্টরূপে করিতে ভালবাসেন প্রকৃষ্টরূপে করাই যাঁহার স্বভাব তিনিই প্রকৃতি। স্বভাবের অভাব নাই তাই প্রকৃতিরও বিরাম নাই। আর আমাদের পুরুষটি চুপ করিয়া থাকিতে, শুইয়া থাকিতে ভালবাসেন—শুইয়াই থাকেন, শুইয়া থাকাই তাঁহার নাকি স্বভাব। তাইতো ‘পুরৌ শেতে ইতি পুরুষঃ’ যিনি ত্রিপুরে ত্রিবিধ শরীরে শুইয়া থাকেন অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অনুস্যূত হইয়া ‘তপ্তায়োবৎ’ বর্ত্তমান থাকেন তিনিই নাকি পুরুষ। তাঁহার ঘুমটা এতই গভীর যে বাঁচিয়া আছেন কি না বুঝিতে পারা যায় না। দর্শনকারগণও তাঁহাকে জানিতে গিয়া কেহ বা অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় ‘অবাঙ্মনসোগোচর’—বাক্যের অগোচর, মনের অগোচর, চিন্তার অগোচর, ধ্যানের অগোচর বলিয়া আপনাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ

করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা মরাকে না থাকার মত মনে করিয়া মরার ভিতরেও তিনি যে কি ভাবে বাঁচিয়া আছেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া, কতকটা বুঝিতে পারিলেও ভাষা দ্বারা তাহাকে কলঙ্কিত করিতে সংস্কার দ্বারা তাহাকে সীমাবদ্ধ করিতে না গিয়া, ভগবান বুদ্ধের ন্যায় চুপ করিয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য পুরুষতত্ত্ব সম্বন্ধে সৎ ও অসৎ উভয় রকমের শ্রুতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণ সাধনার দ্বারা এই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বকে যথাসম্ভব হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে তত্ত্ব বাক্য-মনের অগোচর বলিয়া অস্বীকৃত হইতে বসিয়াছিল, সেই তত্ত্বই আবার 'হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তঃ' অর্থাৎ বিশুদ্ধ বুদ্ধির অধিগম্য হইয়া সাধনবেদ্য অনুভব-বেদ্য পরমাস্বাদনীয় রসস্বরূপে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল। সাধক বলিয়া বসিলেন আমরা ভগবানকে জানিতে পারি না পাইতে পারি না, একথা মোটেই ঠিক নয়; আমরা তাঁহাকে যতটা জানি তাঁহাকে যতটা পাই, এমন আর কোন জিনিসকে জানিতে বা পাইতে পারি না। তাঁহাকে জানি বলিয়াই সব জানিতে পারি। ভগবান আস্বাদ্য, তাঁহার আস্বাদ পাই বলিয়াই আমাদের আত্মীয়স্বজন আমাদের নিকট এত প্রিয়! তিনি সুন্দর বলিয়াই এই জগৎ এত সুন্দর হইয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়। পূর্ণভাবে দেখিতে ধরিতে পাইতে সক্ষম নই

বলিয়াই তো তিনি সংসারের ভিতর দিয়া আত্মীয়স্বজনদের ভিতর দিয়া মন্দীভূত অনুভব-যোগ্য হইয়া আসিয়া দেখা দেন। তাঁহারা এই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব কি ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, পণ্ডিত সাধকগণ হিন্দুদের কালীমূর্ত্তির ভিতর তাহার একটা বেশ সুন্দর নিদর্শন অকাট্য প্রমাণ দেখিতে পান। কালী ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে ত্রিবিধ দেহে দেবাসুর-সংগ্রামে তৎপর। পুরুষ আধাররূপে তাঁহার আদরের প্রকৃতি দেবীকে আপনা হইতে বাহিরে প্রকট করিয়া আনন্দ-সমাধিতে বিভোর।

প্রকৃতি কেন কাজ করেন? অমন পুরুষকে ফেলিয়া কেন বহির্মুখী হন? এই তত্ত্ব লইয়া ধ্যান করিতে গিয়া ঋষিগণ ঋগ্বেদে সৃষ্টির কারণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বসিলেন। "প্রতিচক্ষণায় ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" পরমাত্মা আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজের আনন্দ নিজে গ্রহণ করিবার জন্য আপন যোগমায়াব সাহায্যে বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি যখন ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় কে বাধা দেয়? তবে কেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন একথার উত্তর অবশ্য তিনিই ভাল করিয়া দিতে সক্ষম। হয়ত ইচ্ছা করাই লীলা করাই খেলা করাই তাঁহার স্বভাব। কে তাঁহার স্বভাবে অভাব দর্শন করিবে? তাঁহার কাজে কে বাধা দিবে? তাঁহারই প্রকৃতি তাঁহারই স্বরূপভূতা হলাদিনী শক্তি কি তাঁহার আনন্দের সহায় না হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমাদের ব্যষ্টিপ্রকৃতি আমাদের

সেবার জন্য আমাদের আনন্দবিধানের জন্য যে কত ব্যাকুল, যিনি এই তত্ত্বটি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেই সমষ্টি প্রকৃতির মা আদ্যাশক্তির প্রেমময়ী রাধারাণীর পরম পুরুষের জন্য ব্যাকুল হওয়া শিবের ইচ্ছাপূরণে নিযুক্ত থাকা কৃষ্ণ-সুখৈক-তৎপরা হওয়া যে কি পদার্থ তাহা কতকটা আস্বাদ করিতে সক্ষম হইবেন। আসল কথা, পুরুষের লীলার সহায় হওয়া পুরুষের লুকোচুরির মধ্য দিয়া পুরুষকে প্রকাশ করা পুরুষকে আনন্দ দেওয়া পুরুষকে আনন্দে রাখাই মা আদ্যাশক্তির মহামায়া প্রকৃতি দেবীর সমস্ত কার্য্যকলাপের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানে মনে রাখিতে হইবে সাধকের মা আনন্দময়ী, সাংখ্যদর্শনের অচেতনা জড়-প্রকৃতি নহেন। সাধকগণ পুরুষ ছাড়া প্রকৃতির, প্রকৃতি ছাড়া পুরুষের কল্পনা করিতে যে অসমর্থ! এই যুগল রূপ ছাড়া কোন একটি তত্ত্ব কোন একটি পরমাণু নাকি তাহার আপন স্বরূপ বজায় রাখিতে সমর্থ নয়। প্রকৃতি দেবার মা মহামায়ার সমস্ত কার্য্যকলাপ সমস্ত চেষ্টাচরিত্রই যে লীলাত্মক। পুরুষ যখন লীলাতৎপর রসিকশেখর, তখন তাঁহার প্রকৃতি কি লীলাময়ী হইয়া রসের খেলা লইয়া ব্যগ্র না থাকিলে চলে? প্রকৃতির এই লীলাখেলার একটু আস্বাদ পাইয়াই তো কোন সাধক গাহিয়াছেন 'মরি কার এ বালিকা ধূলো-খেলা খেলিতেছে'। সাধক ভক্ত কতরূপে কতভাবে যে মায়ের এই লীলা-খেলা আস্বাদ করিতে বর্ণনা করিতে প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়া

গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এতত্ত্ব সাধনবেদ্য ধ্যানযোগে সাধকদেরই আস্বাদ্য। লীলাখেলার জন্য লুকোচুরি আবশ্যক। সুতরাং মায়ের এই লুকোচুরি-খেলাও তাই আবরণ-বিক্ষেপাত্মক। একবার বাবাকে লুকাইয়া রাখিবেন ঢাকিয়া রাখিবেন নিজেও কতকটা লুকাইয়া পড়িবেন; আর একবার প্রকাশ করিবেন প্রচার করিবেন, নিজেও অনন্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়া সাধক ভক্তদের কাছে ধরা দিবেন। দর্শনকারগণ 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' আদি শ্রুতির ভিতরে পুরাণাদি-গ্রন্থে অবতার-তত্ত্বের ভিতরে এই তত্ত্বের কতকটা আভাস দিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভাগবত পরম রসিক-শেখরের লুকোচুরি-খেলার মধ্য দিয়া, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত কৃষ্ণের মালিনী নাপ্তিনী চিকিৎসক আদি বেশের ভিতর দিয়া এই তত্ত্ব ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি কখন লুকান ভাগবতের "তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥" গোপীদিগের সৌভগমদ এবং মান দর্শন করিয়া তাহাদের কারণ-শরীরে অবস্থিত পরমাত্মা তাহাদিগকে শান্ত করিয়া অনুগৃহীত করিবার জন্যই সেখানেই সেই গোপিকাদের ভিতরেই লুকাইয়া পড়িলেন। আবার উপযুক্ত সময় তাঁহার আবির্ভাবের স্থানটিও যে গোপীগণই গোপীদের ত্রিবিধ-দেহই তাহা বুঝাইবার জন্য সেখানেও 'তাসামাভিরভূৎ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধকগণ

বলেন, সেই চোরাগ্রগণ্যের নাকি লুকোচুরি-খেলাই স্বভাব! তাই সব কাজেই তাঁহার যোগমায়ার এতটা আবশ্যক। বেদান্ত-দর্শন মায়াকে 'আবরণ-বিক্ষেপাত্মিকা' বলিয়া এই তত্ত্বেরই কতকটা আভাস দিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

বুঝিতে পারা গেল তিনি লীলাময়, লীলাখেলা লইয়া লুকোচুরি লইয়া সর্ব্বদা লীলারসে বিভোর থাকিতেই ভালবাসেন। তাঁহার পক্ষে যে এটা একটা বেশ সুন্দর লীলা তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। তিনি তো গোলোকধামে বসিয়া লীলাখেলা করেন, আর তাঁহার লীলার সহচর জীবগণ যে ভব-কারাগারে বসিয়া হাহাকার করিয়া মরে! এ অবস্থায় তাঁহাকে আর কি করিয়া দয়াময় প্রেমময় দীনবন্ধু ভক্তবৎসল সর্ব্বভূত-হিতে রত বলা চলে? কিন্তু সাধকগণ জানেন বিপরীত ভাব বিনা দ্বন্দ্বভাব বিনা লীলাখেলা একেবারে অসম্ভব। সতীর গৌরব বুঝাইতে অসতীর হাবভাব কার্য্য-কলাপও কম প্রয়োজনীয় নহে। রামায়ণের জন্য রামের যতটা দরকার রাবণের যে তাহা অপেক্ষা কম দরকার তাহা বলা চলে না। এই উভয়ের চরিত্রের মধ্য দিয়া লোককে যে রামের মত করিয়া পরমানন্দের অধিকারী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। হিরণ্যকশিপু না থাকিলে কে এমন সুন্দর করিয়া প্রহ্লাদ-চরিত্রটি ফুটাইয়া বাহির করিয়া আমাদিগকে প্রহ্লাদের মত হইয়া ভগবৎতত্ত্বকে

এমন সুন্দরভাবে আস্বাদ করিতে শিক্ষা দিত? বিপরীত যখন একান্ত ভাবে আবশ্যক হইয়া পড়ে লীলার সহচর হইয়া উঠে, তখন যদি সেই বিপরীতের ভিতর দিয়া কল্যাণের শান্তির আনন্দের একটা সুন্দর রাস্তা দেখাইয়া দেওয়া যায়, তবে আমরা সেই বিপরীতকে বিপরীত বলিয়া ঘৃণা না করিয়া আনন্দের সহায় মনে করিয়া আনন্দের সহিত বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়া পড়ি। অজ্ঞানীর অসুবিধা দুঃখ-কষ্ট দর্শন করাইয়া মানুষকে জ্ঞানের পথে লইয়া যাইতে, অবিশ্বাসী অভক্তের পদে পদে ভাবনা চিন্তা অশান্তির ভাবটা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া তাহাকে বিশ্বাসের পথে ভক্তির পথে চলিবার জন্য প্রলোভিত করিতে, পাপীর যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও নরকযন্ত্রণার স্বরূপটা দেখাইয়া সকলকে পুণ্যের পথে কল্যাণের পথে আনন্দের পথে চালিত করিবার জন্যই নাকি লীলাময়ের এই বিরুদ্ধজাতীয় কার্য্যকলাপ, দ্বন্দ্ব-খেলা লইয়া এতটা লীলারহস্য। উদ্দেশ্য মর্ত্ত্যধামে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা, তাঁহার প্রিয়তম জীবকে তাহাদের আপন আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অক্ষয় আনন্দ-রসে বিভোর করিয়া রাখা। আমরা এদিকেও দেখিতে পাই জ্ঞানী বিশ্বাসী ভক্ত কি ভাবে তাঁহার লীলারহস্য অবগত হইয়া যাবতীয় দ্বন্দ্বভাবকে লীলারই সহায় জানিয়া এই উভয় ভাবের মধ্যেই কি ভাবে আনন্দসমাধিতে বিভোর থাকেন। তাঁহা-দিগকে দেখিয়াই তো আমরা ভাল হইতে কল্যাণসাধন করিতে

আনন্দলাভ করিতে পূর্ণতালাভ করিতে, এক কথায় ভগবানকে পাইতে এতটা ব্যাকুল হইয়া পড়ি। তাঁহাদের কথা ভাব ও কাজই তো আমাদিগকে ভগবানে বিশ্বাস করিতে ভগবৎবিধান মানিয়া চলিতে এতটা উৎসাহিত করিয়া তুলে। অজ্ঞানী অবিশ্বাসী অভক্ত অসাধক মুক্তিকে বন্ধন মনে করিয়া রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া স্বেচ্ছাকৃত খেলাকে পরেচ্ছাকৃত কর্ম্মভোগ মনে করিয়া স্ববাসকে জেলখানা মনে করিয়া নানারূপে নানা-ভাবে কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। বলিতে পার, অনেকে তো একটা ঘোর তামসিক সুখে মগ্ন হইয়া তামসিক সুখ লইয়া বেশ আনন্দে দিন কাটাইতেছে। যাঁহারা ইহার স্বরূপটি প্রকৃত তত্ত্বটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু বেশী দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে ইহাদেরও ভবিষ্যতে একটা দ্বন্দ্বভাব-জনিত অশান্তির দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া গিয়া পরম শান্তিলাভের অধিকারী হইতে হইয়াছে। ইহাদের নিকট হইতে মুক্তিধাম অনেক দূর। ইহারা এখন পর্য্যন্ত মুক্তিধামের আনন্দ-সমাচার শুনিতে সক্ষম হয় নাই, তাই মুক্তিধামে যাইবার জন্য এখনও ইহাদের ভিতরে একটা তীব্র পিপাসা উৎপন্ন হয় নাই বলিয়াই ইহারা এইভাবে অনিত্য বিষয়ানন্দে বিভোর রহিয়াছে। আসল কথা, অজ্ঞানীর অবিশ্বাসীর অভক্তের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টভোগও যে তাহাদিগকে জ্ঞানী বিশ্বাসী ও

ভক্ত করিয়া তুলিবার জন্য, এ তত্ত্বটি বেশ সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে হইবে। অজ্ঞানী কেন এত কষ্ট পায়, কেন এত অস্থির হয়? ইহার মধ্যেও আমরা একটা সুন্দর রহস্য দেখিতে পাই। জেলখানায় সুখ থাকিলে আরাম থাকিলে শান্তি থাকিলে কেহ কি আর সুপথে চলিয়া নিজের স্বধামে যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়? যাহা অসৎ যাহা চঞ্চল যাহা কষ্টের কারণ তাহাকে সৎ বলিয়া স্থির বলিয়া সুখকর বলিয়া প্রতারিত হইতে তিনি কি তাঁহার ভক্তগণকে অনুমতি দিতে পারেন? তাই সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া দেওয়াই যে তাঁহার একটা প্রধান কাজ। চঞ্চলতা বাধা-বিঘ্ন সৃষ্ট হইয়াছিল স্থিরকে অবাধিতকে পরম মঙ্গলকে মুক্ত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য। বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে চঞ্চলতা না থাকিলে স্থিরতার, গতি না থাকিলে স্থিতির, অভাব না থাকিলে স্বভাবের, নিরানন্দ না থাকিলে আনন্দের, অসুখ না থাকিলে সুখের, অসুর না থাকিলে সুরের, জগৎ না থাকিলে ব্রহ্মের ধারণা করা উপলব্ধি করা—এমন কি, কল্পনা করাও অসম্ভব হইয়া পড়িত।

তারপরে দেখা যাক্, প্রকৃতি চঞ্চলতা দেখায় কখন কাহার নিকট? যে ব্যক্তি ব্যষ্টিভাবে সীমাবদ্ধ যাহার শিবের দিকে দৃষ্টি নাই, তাহার সীমাবদ্ধ ভাব দূর করিয়া তাহাকে শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই প্রকৃতির যত চঞ্চলতা। ব্যষ্টি সমষ্টির অংশ,

সমষ্টিরই তালে তালে সমষ্টির সঙ্গে চলিয়া সমষ্টির কার্য্যের ভিতর দিয়া সমষ্টি-প্রকৃতির উদ্দেশ্যপূরণে সমষ্টি প্রকৃতির অন্তরাত্মা যে পুরুষ-চৈতন্য তাঁহার প্রীতিসম্পাদনে বাধ্য। ব্যষ্টি-প্রকৃতি যখন অহংকার-বিমুগ্ধ হইয়া ব্যষ্টি-অহংকারও যে প্রকৃতিরই একটা তত্ত্ববিশেষ তাহা ভুলিয়া গিয়া সমষ্টি-প্রকৃতির কাজে বাধা দেয়, অজ্ঞানবলে কাজে বাধা দিতে সমর্থ বলিয়া অহংকার করিতে আরম্ভ করে, তখনই সমষ্টি-প্রকৃতি তাহাকে তাহার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করাইয়া প্রকৃত আত্ম-নিবেদন-তত্ত্বের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া সমষ্টি-প্রকৃতির অনুকূল করিয়া পুরুষসেবার অধিকার দান করে। রাধারাণী সমষ্টি-প্রকৃতি মা আদ্যাশক্তি পরম পুরুষের সেবায় বিভোর! তাঁহারই কায়ব্যূহরূপ সখীবৃন্দ নিত্যসিদ্ধ সাধকমণ্ডলী রাধা-রাণীর সেবার সহায় হইয়া কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্য—পরমাত্মার আনন্দবিধানকেই সারতত্ত্ব বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। প্রাণরূপা মঞ্জরীগণ আবার সখীগণের সেবিকা। বৈষ্ণবগণ এই তত্ত্বের ভিতর দিরা সাধনরাজ্যের একটা পরম তত্ত্ব চরম রহস্য বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমষ্টিভাব সাধনের অনুকূল—দেবভাবের প্রকাশক। ব্যষ্টিভাব সাধনের প্রতিকূল—অসুর-ভাবের দ্যোতক।

আমরা দেখিতে পাই, যে সহজে ক্ষেপিয়া উঠে তাহাকেই সকলে ক্ষেপাইতে চেষ্টা করে, যে সহজে

কাঁদে তাহাকেই সকলে কাঁদাইয়া আনন্দলাভ করে। ইহার ভিতরেও আমরা প্রকৃতির একটা গূঢ় অভিপ্রায় লুক্কায়িত দেখিতে পাই। প্রকৃতি চান আমরা শান্ত হই স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হই শিবত্ব লাভ করি। আমরা যে প্রকৃত পক্ষে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' অমৃত-তত্ত্বেরই পূর্ণাধিকারী, আমরা যে স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ সেই তত্ত্বটী আমরা ভুলিয়া গেলেও আমাদের মঙ্গলময়ী আনন্দদায়িনী মা প্রকৃতি দেবী তো আর এত সহজে ভুলিয়া যাইতে পারেন না। তিনি আমাদিগকে জানাইতে চান বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, আমরা নিত্য আমরা স্থির আমরা শিবস্বরূপ। সাধকগণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন যে আমাদিগকে স্থির করিবার জন্যই মায়ের এত চঞ্চলতা, আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য মা আমাদের এই অ-সুখ সৃষ্টি করিয়াছেন। মুক্তি দেওয়ার জন্যই মুক্ত করিবার জন্যই মুক্ত যে আছ তাহা বুঝিয়া লওয়ার জন্যই তিনি এই বন্ধন-বোধ সৃষ্টি করিয়াছেন। অ-সুখটা কি করিয়া সুখকে প্রকাশ করে সুখপ্রকাশের সহায় হয়, তাহা আমরা একটু চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারি। প্রকৃতি আমাদের সব কাজ করিয়া যাইতেছেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার কাজ সুচারুরূপে অবাধিতভাবে সুসম্পন্ন হইয়া যাইতে থাকে, সে পর্য্যন্ত কোথাও বাধা নাই কোথাও ব্যাধি নাই কোথাও অসুখ নাই। যেই তাঁহার কাজে বাধা আরম্ভ হইল, যেখানে তাঁহার কাজে বাধা

আরম্ভ হইল, সেখানেই তখন একটা ব্যাধির একটা দুঃখবোধের একটা অ-সুখ বোধের সৃষ্টি করিয়া সেই সমস্ত বাধা দূর করিবার জন্য অসুখ দূর করিবার জন্য প্রকৃতি আমাদিগের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিলেন। এই ব্যাধি এই অ-সুখবোধ না থাকিলে আমাদের সুখে থাকা কেন, জীবনধারণ করাও যে অসম্ভব হইয়া পড়ে। সাধকগণ অসুখের ভিতরে সুখ, অরূপের ভিতরে রূপ, অব্যক্তির ভিতরে ব্যক্তিতত্ত্ব দর্শন করিয়া তাহার ধ্যানে তাহা লইয়া আনন্দসমাধিতে বিভোর হইয়া যান। প্রকৃতি আমাদিগকে লইয়া যাইতে চান সেই সুখ-দুঃখের অতীত আনন্দধামে শিবলোকে, তাই যে পর্য্যন্ত সুখে দুঃখে সমভাব লাভ করিয়া আমরা সুখ-দুঃখকে জয় করিতে সমর্থ না হইব, সে পর্য্যন্ত প্রকৃতি দেবী আমাদিগকে সুখদুঃখের তরঙ্গাঘাতে ব্যথিত করিয়া আমাদিগকে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ করিতে চেষ্টা না করিয়া কি করিয়া থাকিবেন! যখন আমরা বিপদে সম্পদে জয়ে পরাজয়ে সুখ্যাতি অখ্যাতিতে সুখে দুঃখে জীবনে মরণে একটা সমভাব আনিয়া দ্বন্দ্বাতীত হইয়া বসিতে পারিব, তখন সেই দ্বন্দ্বাতীত উদাসীন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ আমাদিগের সেবা করা সন্তোষবিধান করা আনন্দের সহায় হওয়াই হইবে আমাদের কল্যাণময়ী আনন্দময়ী মা ভগবতীর প্রধান কাজ।

প্রকৃতি ভীষণ কোথায়, না পুরুষ নাই যেথায়। যেখানে পুরুষের উপলব্ধি নাই পুরুষের দৃষ্টির অভাবে পুরুষ নাই

বলিয়া অনুভূত হয় সেখানেই প্রকৃতির যত চঞ্চলতা। দেবাসুরের সংগ্রামের ভিতরে যে মুহূর্তে মার আমার একবার পদানত আধারভূত শিবতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি পড়িল, অমনি তিনি লজ্জায় বিভোর হইয়া সমস্ত চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া দাঁতে জীব কাটিয়া স্বামীর অঙ্গে গিয়া একেবারে লুকাইয়া পড়িলেন। "প্রকৃতি স্বামীর অঙ্গে লীন, আদরিণী থেমেছে এবার, রবি শশী তারকা কোথায়—ভ্রান্তি ভ্রান্তি ভ্রান্তি সমুদায়।" সাংখ্যদর্শন "প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তি ইতি মে মতির্ভবতি যা দৃষ্টাঽস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য" এই শ্লোকটির ভিতর দিয়াও এই তত্ত্বই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। যাঁর একবার পুরুষে দৃষ্টি পড়িয়াছে, যিনি অনেকটা পুরুষে স্বরূপে স্থিত রহিয়াছেন, এক কথায় যিনি শিবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটই প্রকৃতি শান্ত তাঁহার সেবাতেই প্রকৃতি সচেষ্টা তাঁহার আনন্দবিধানেই প্রকৃতি তৎপরা। শিবত্ব কোথায় তাহা দেখিয়াছ কি? যদি শিবত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা থাকে যদি মৃত্যুঞ্জয় হইতে ইচ্ছা কর, তবে ঐ সমাধিমগ্ন মায়ের পদানত আধারভূত শিব-মূর্ত্তিটির দিকে একবার চাহিয়া দেখ; তিনি নীরবে থাকিয়াও তোমাকে তাঁহার শিবতত্ত্ব স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিবেন। তখন তাঁহার সেই নীরব সুরের মধুর বাণী তোমার সমস্ত জীবনটিকে শিবময় মঙ্গলময় আনন্দময় করিয়া তুলিবে। শিবের বুকের

উপরে ত্রিগুণময়ী মা আত্মাশক্তি ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে বিশেষতঃ সমষ্টিভূত জগৎরূপে দেবাসুরের সংগ্রাম লইয়া কি ভাবে তাণ্ডব-নৃত্যে বিভোর হইয়াছেন রণমদে মাতিয়া উঠিয়াছেন, একবার সেই দিকে দৃষ্টি কর; একবার চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখ কিভাবে অসীম গ্রহ-নক্ষত্রগুলি তাণ্ডব-নৃত্যে বিভোর হইয়া তোমার মাথার উপর দিয়া অদম্য বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! সমষ্টিভাবে সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ডের ব্যষ্টিভাবে প্রতি পরমাণুর প্রতি রক্তবিন্দুর ভিতরে কি এক মহান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলিতেছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। অপর দিকে একবার শিবের দিকে একবার শান্তস্বরূপ জগৎব্রহ্মাণ্ডের চালকের দিকে চাহিয়া দেখ, তিনি কিভাবে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে সংযত নিয়মিত কেন্দ্রীভূত করিয়া জগতের মঙ্গলসাধনে তৎপর রহিয়াছেন। উভয় ভাবের সমন্বয় যেখানে, সেখানেই সেই যুগল-মূর্ত্তির সেই যুগল-প্রীতির ভিতরেই রহিয়াছে হিন্দুদের সমস্ত সাধন-ভজনের মূল রহস্য। অতি সুন্দরভাবে লুক্কায়িত থাকিয়াও সাধক-ভক্তদের নিকট ইহা চির প্রচলিত। আমাদের ভিতরেও সেই শিবতত্ত্ব আত্মারূপে এবং শক্তিতত্ত্ব ত্রিবিধ-দেহরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ভগবানের লীলারস বিস্তার করিতে বসিয়াছেন। 'আমাদের এই ত্রিবিধ-দেহের সমস্ত তত্ত্বগুলি জগৎব্যাপী সমষ্টিদেহের প্রতিতত্ত্বের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে সম্বন্ধ। সমস্ত জগতের ঘাত-প্রতিঘাতগুলি আসিয়া স্বাভাবিক ভাবে আমাদের

এই ত্রিবিধ-দেহের উপরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখাইতে বাধ্য। এক কথায়, সমস্ত প্রকৃতি উলঙ্গভাবে মুক্তভাবে আমাদের সম্মুখে তাঁহার তাণ্ডবলীলা প্রকাশ করিতে কিছুতেই বিরত হইবেন না। প্রকৃতির এই দ্বন্দ্বভাবের তাণ্ডবলীলাকে পুরুষের আনন্দলাভের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া আমাদের আত্মবিকাশের অনুকূলরূপে বুঝিয়া অনুকূলভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলে আমাদের আর কোথাও বিশ্রামের আশা নাই। আমরা যদি এই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির তাণ্ডব-নৃত্যের মধ্যে আমাদের ভিতর-কার সেই 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' 'আনন্দরূপমমৃতম্'এর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত দ্বন্দ্বভাবের ভিতরে শান্ত থাকিতে উদাসীন থাকিতে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে প্রকৃতি দেবী তখন তাঁহার সমস্ত উগ্ররূপ পরিবর্তন করিয়া আমাদের পরিণতির আমাদের আনন্দলাভের সহায় হইবেন। তুফান ভয় দেখায় কাহাকে ? যে নদীতে নামিয়া সমুদ্রে নামিয়া আপনার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া যায়। যিনি নদীর সমুদ্রের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ঐ সমস্ত ভীষণ তুফানগুলি তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে লুটিয়া পড়িয়া তাঁহার পদধৌত করিয়া দিয়া যে আপন জীবন সার্থক করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। "নির্ব্বাসনং হরিং দৃষ্ট্বা পলায়ন্তে বিষয়দন্তিনঃ পলায়িতুং ন শক্যাস্তে সেবন্তে কৃত-চাটবঃ।" বিষয় তখন সংসার তখন প্রকৃতি তখন সেই নির্ব্বাসন পুরুষসিংহকে দেখিয়া দূরে পলায়ন করিতে

চেষ্টা করে, পলাইতে সক্ষম না হইলে কাছে গিয়া গোলামের ন্যায় সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে বসে।

প্রকৃতি ভগবৎবিভূতি, প্রকৃতির বিধান সুতরাং ভগবৎ-বিধান—তাইতো ইহা অমোঘ। প্রকৃতির সব বিধানগুলি লোকে যত সহজ মনে করে তত সহজ নয়। ইহাই তো বেদ ইহাই তো

প্রকৃতি

ভগবানের চিৎবিভূতি। যত জানি ততই অজানা অংশ অনুভবে আসিয়া কত যে জানি না তাহাই প্রমাণ করিয়া দেয়। বড় বড় জ্ঞানীরা না জানার অংশ কত বেশী তাহাই মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "Like a child gathering pebbles on the seashore while the vast ocean of truth remains unexplored." অসীম জ্ঞানসমুদ্রের বেলাভূমিতে আমরা উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।" "The more our knowledge is increased the more our ignorance is discovered." "নাহং বেদ সুবেদেতি" "যত জানি তত জানি না"। যেটুকু জানি যেটুকু বুঝি যেটুকু পালন করি সেইটুকুর উপরেই আমাদের

কতকটা কর্তৃত্ব জন্মে। "Study the law of nature, follow it and you will be the master of it." প্রাকৃতিক বিধান জান পালন কর, তুমি ইহার উপর আধিপত্য লাভ করিবে। এই যে কর্তৃত্বলাভ ইহাও প্রকৃতির বিধানেরই অন্তর্গত। শান্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক পরিবারে সমাজে অনেকটা কর্তৃত্ব লাভ করে। ইহাও পারিবারিক ও সামাজিক বিধানেরই অন্তর্গত। এই কর্তৃত্বটি লইয়াই বীরাচার। ইহা লইয়াই 'None but the brave deserves the fair' 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—ইহা লইয়াই 'তেজীয়সাং ন দোষায়'।

এখানে কর্তৃত্বলাভ ও দোষ সম্বন্ধে একটু বিচার আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যত জানি ততই না জানা অংশ যে কত বেশী তাহা যেন নজরে পড়ে। অনন্তদেবের সবই যে অনন্ত, তাঁহার চিৎবিভূতিও যে অনন্ত! এখানে অনন্ত মানে সান্তের বিপরীত নহে—আমরা যতটুকু জানি তাহাও সেই অনন্তেরই অংশ। সীমা দিয়া শেষ করিতে পারি না বলিয়াই তো তিনি অসীম! আমাদের মানদণ্ড তাঁহাকে মাপিতে গিয়া সীমাবদ্ধ করিতে গিয়া হার মানিয়া ফিরিয়া আসে। তবে এই মাপার চেষ্টার মধ্যে তাঁহারই যে অনেকটা অংশ জানা হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকৃতির বিধান অনন্ত হইলেও সেগুলি জানিবার চেষ্টা করিয়া কতকটা জানিয়া যে জগতের প্রচুর কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। চিৎবিভূতি আপনি

বিকাশ পাইতে সচেষ্ট, তাই জ্ঞানও যে আমাদিগকে কেমন লোভ দেখাইয়া কেবল সম্মুখের দিকে লইয়া যাইতেছে। কোথায় শেষ না জানিলেও এই চলার মধ্যেও একটা মস্ত আনন্দ বর্ত্তমান। চলিয়াছি আমারা পরমাত্মার দিকে পরম প্রেমাস্পদের দিকে; তিনি পূর্ণ তাই যতই তাঁর দিকে অগ্রসর হইতেছি ততই সব বিষয়ে পূর্ণতা লাভ হইবার সুযোগ জুটিতেছে। নিজের সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ—যাহা সব জীবের লক্ষ্য যাহা সব জীবের ঈপ্সিত যাহা পরম তৃপ্তির পরম শান্তির নিদান, তাহার আস্বাদ তাহার অনুভূতি বর্দ্ধিত হইতেছে; সুতরাং এ চলায়ও যে মহা তৃপ্তি মহা আনন্দ! পথ অনন্ত হইলেও যতটুকু অতিক্রম করিয়াছি ততটুকু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া ততটুকুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের কতকটা কর্ত্তৃত্ব লাভ হইয়া যাইতেছে। নীচের ক্লাশের পাঠ শেষ করিয়া উপরের ক্লাশে উঠিয়া ক্রমে শিক্ষাবিভাগের উন্নত অধিকার লাভ করিতেছি। আগে যাহা বুঝিতে পারিতাম না এখন তাহা অনেকটা বুঝিতেছি। আগে না জানার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার অভাবে যে বিধানগুলি দুঃখ-কষ্টের অনিবার্য্য কারণ হইয়া পড়িত, এখন সে সবই জানার জন্য আমার উন্নতির আমার আনন্দের সহায় হইতে বসিয়াছে। আগে যে চাকু হাত কাটিয়া কষ্ট দিত এখন তাহা ফল কাটিয়া আনন্দের সহায় হয়। আগে যে জল যে অগ্নি যে বিদ্যুৎ কষ্টের কারণ হইয়া ভয় জন্মাইত, এখন তাহারা

সুখের কারণ হইয়া আরামের সহায় হইয়া মিত্ররূপে পরিণত হইতে বসিয়াছে। যে সমুদ্র পূর্ব্বে ডুবিয়া মরিবার ভয় দেখাইত সে সমুদ্রকে এখন আমরা জাহাজে চড়িয়া অবহেলায় অতিক্রম করি, সাবমেরিণে বসিয়া তাহার অতল-তলের সীমা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করি, তাহার রত্নরাজি এখন আমাদের ভোগের সহায় হয়। যে বিদ্যুৎ আগে ভীতির সঞ্চার করিত, সে আজ আলো-হাওয়ারূপে আমাদের সেবা করিতেছে। অজ্ঞানের জন্য যে জমিতে আগে পা রাখিতে ভয় হইত, সে জমির গুণ ও স্বভাব অনেকটা অবগত হইয়া আমরা তাহার উপর দিয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেছি, তাহাকে আমাদের উন্নতির আরামের সহায় করিয়া তুলিয়াছি। আমার অসংযমের ফলে যে পুলিশ আমাকে শাসন করিত, সে আজ আমার শান্তি-রক্ষকরূপে বর্ত্তমান। যে মা-বাপ আমার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য আমাকে শাসন করিতেন, তাঁহারাই আজ আমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া আমার আরামবিধানে সদাই তৎপর। যে প্রকৃতি আমাকে পদে পদে আঘাত করিত, সে প্রকৃতি আজ আমার উপর সুপ্রসন্ন ; সে আজ পরম স্নেহময়ী মাতার ন্যায় আমার সেবা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে। ইহার মধ্যে আমরা প্রকৃতির এই মহান উপদেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাই যে, বিধান জানায় বিধান মত চলায় কত সুখ কত শান্তি, আর বিধান না জানায় বিধান না মানায় কত দুঃখ কত অশান্তি! ইহা

যেন প্রকৃতি জ্বলন্ত অক্ষরে তাঁর সব পদার্থের গায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। হিন্দুগণ প্রকৃতির এই মহান শিক্ষা বিশেষভাবে লাভ করিয়া প্রকৃতিকে যে কতটা অনুভবে আনিয়াছিলেন তাঁহাদের কাজে ও শিল্পে বিশেষভাবে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মা আদ্যাশক্তি প্রকৃতি দেবীর দশ-মহাবিদ্যারূপে ধ্যান ও পূজার ব্যবস্থা তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী। ছোট ছেলেমেয়েকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে পরিণত করিতে প্রকৃতি যত সচেষ্টা, তাহারা তাহাদের মা-বাপ বা আত্মীয়স্বজন তাহার কোটী ভাগের এক ভাগও সচেষ্ট নহেন। অথচ তাহারাই যদি প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়ে, বা কাপড়ে আগুন লাগাইয়া দেয়, তবে তখন সেই প্রকৃতিই অতি নির্ম্মমভাবে তাহাদের দেহকে ভেঙ্গেচুরে বা পুড়িয়ে ছারখার করিতে বিন্দু মাত্রও ইতস্ততঃ করিবেন না। একদিকে তিনি যেমন দয়াময়ী স্নেহময়ী বরাভয়-ভূষিতা সন্তানের আনন্দবিধানে তৎপরা, অপর দিকে তিনি আবার তেমনি পাষাণময়ী হৃদয়হীনা অসিমুণ্ড ধারিণী সন্তানশাসনে দুষ্টদলনে উদ্যতকরা! 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি' এই দুই ভাবের সমন্বয় পূর্ণভাবে কেবল তাঁহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। কালীমূর্ত্তির ভিতর দিয়া প্রকৃতির এই তত্ত্ব অতি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া বাহির করা হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এ সব মূর্ত্তি নাকি অসভ্য বর্ব্বরদিগের নিকট হইতে হিন্দুরা লাভ করিয়াছেন! সময়-

বিশেষে অবস্থাবিশেষে আঙ্গুর যে বাস্তবিকই টকরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে! এ বর্ণনার মূলে যে বিশেষরূপে অজ্ঞানতা বর্ত্তমান তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই; সুতরাং ইহা স্বাভাবিক জানিয়া এ সব কথায় অবিচলিত থাকাই শ্রেয় মনে হয়।

প্রকৃতির এইরূপ বিপরীত দুই ভাব কেন? প্রকৃতি মঙ্গলময়ী—তিনি যে আমাদের মা! তাই আমাদিগকে তাঁহার শান্তিধামে আনন্দমহলে লইয়া গিয়া আমাদেরে তাঁহার সচ্চিদানন্দের পূর্ণ অধিকার দান করিতে তিনি বিশেষ সচেষ্ট। সেখানে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা তাঁহার বিধান মতে চলা। সুতরাং তাহার বিধান মতে না চলিলে তাঁহার বিধানের অবমাননা করিলে কুপথে বিনাশের পথে চলিতে গেলে, মা তাহা হইতে রক্ষা না করিয়া কি থাকিতে পারেন! তবে বলিতে পার শাস্তিটা বড়ই ভয়ঙ্কর। কিন্তু যে মাকে কতকটা চিনিয়াছে অর্থাৎ যে মাতৃভক্ত, সে ইহা ভয়ঙ্কর ভাবিতে ভয়ঙ্কর বলিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহে। যাহারা মাকে মোটেই জানে না মার বিধানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যাহারা শুধু বর্ত্তমানে সীমাবদ্ধ, যাহারা বেশপরিবর্ত্তনকে বিনাশ মনে করে, যাহারা মৃত্যুর পরে কি অবস্থা হয় তাহা কিছুই অবগত নহে, তাহাদের এসব কাজ যে বাস্তবিকই ভয়ঙ্কর মনে হইবে; যাহাদের হাতে আলো রহিয়াছে, যাহারা অভিজ্ঞ দক্ষ সুচালকের সঙ্কেতে চলিয়াছে, আলোর সাহায্যে

সম্মুখের সুদৃশ্য কতকটা অনুভব করিতে পারিতেছে, তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে মোটেই ভয় পায় না। আর যাহারা রহিয়াছে অন্ধকারে, বাস করে অবিশ্বাসে, চলে শুধু মদ-গর্ব্বে, সম্মুখে দেখে কেবল অন্ধকার—শূন্যই শূন্য, তাহাদের প্রতি পদ-ক্ষেপে ভয় হওয়াই যে স্বাভাবিক। আস্তিক ভক্ত বিপদকে সম্পদের সূচনা মনে করিয়া মৃত্যুকে ভগবৎধামের সরণি জানিয়া কি ভাবে আনন্দের সহিত তাহাদিগকে বরণ করেন, তাহা ভারতবাসী ভক্ত সাধক বিশেষভাবে অবগত আছেন। ইহার দৃষ্টান্ত এদেশে মোটেই বিরল নহে।

এখন দেখা যাক্ প্রকৃতির বিধান-অবমাননা কাহাকে বলে, প্রকৃতির বিধান কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে কি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃতির বিধান অমোঘ, সুতরাং তাহা লঙ্ঘন করিবে কিরূপে? তবে এই লঙ্ঘন করা কাজটি যে আসলে একটি আপেক্ষিক ব্যাপার তাহা ভুলিলে চলিবে না। জলে ডুবিয়া মরার মধ্যে যেমন প্রাকৃতিক বিধান দৃষ্ট হয়, জলের উপরে চলার মধ্যেও ঠিক তেমনি প্রাকৃতিক বিধান দেখা যাইবে। আগুনে হাত দিলে হাত জ্বলিবে ইহা যেমন প্রকৃতির নিয়ম, অবস্থাবিশেষে কৌশল-প্রভাবে আগুনে হাত দিলেও যে হাত জ্বলে না তাহাও তেমনি সেই প্রকৃতিরই নিয়ম। বিষ খেয়ে মরে যাওয়া আর না মরার মধ্যে প্রাকৃতিক বিধান জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত দেখা যায়। আমরা বিধানের যতটা জানি

তাহাকেই স্বীকার করি, যেটা জানি না সেটাই অতিপ্রাকৃত মনে করি; তবে তাহাও যে আমার অজানা কতকগুলি প্রাকৃতিক বিধানেরই অন্তর্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারাদি এইরূপ আমাদের অজ্ঞাত কতকগুলি প্রাকৃতিক বিধানেরই যে অন্তর্গত তাহা মনে রাখিতে হইবে। দূরের জিনিস দেখা যায় না দূরের কথা শোনা যায় না ইহা যে প্রকৃতির নিয়ম, অবস্থাবিশেষে ব্যক্তি-বিশেষের দূর-দর্শন দূর-শ্রবণ আদি অলৌকিক বিভূতিও সেই প্রকৃতিরই উচ্চাঙ্গের বিধানগুলির মহিমা ঘোষণা করে। যোগীদের সমস্ত অলৌকিক অনুভূতির, বিজ্ঞানের সব অলৌকিক আবিষ্কারের ভিতরেও আমরা প্রকৃতির এমন কতকগুলি তত্ত্ব দেখিতে পাই, যাহা আমাদের অপেক্ষা নিম্নস্তরের লোকেরা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক অপ্রাকৃত বলিয়া কল্পনা করিতে বাধ্য! জ্ঞানরাজ্যে প্রকৃতির রহস্যবিষয়ে আমরা যত উপরের স্তরে উঠিতে থাকিব, ততই নিম্নস্তরের লোক অপেক্ষা আমাদের জ্ঞান আমাদের জ্ঞান জন্য শক্তি ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিবে, নীচের লোকেরা আমাদিগকে ততই তেজস্বী অপ্রাকৃত ও অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মনে করিবে। তাহারা যে কাজ করিতে অক্ষম আমরা সে কাজ করিতে সমর্থ। তাহারা যাহা ধারণায় আনিতে পারে না, আমরা তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারি। তাহারা যাহা জীর্ণ করিতে পারে না আমরা তাহা বেশ সহজে

হজম করি। তাহাদের যাহা কষ্টের কারণ আমাদের তাহা সুখ-বিধানে সক্ষম। তাহাদের পক্ষে যাহা উন্নতির কল্যাণের বিরোধী বলিয়া দোষকর, আমাদের পক্ষে তাহাই যে আবার বিপরীত বলিয়া হিতকর। তাহাদের পক্ষে যাহা রোগ আমাদের পক্ষে তাহা ভোগের নিদান। বিষ্ণু অনন্ত-শয়নে শোভমান, আর আমাদের ওভাবে জলে শয়ন মৃত্যুর কারণ। মহাদেব যে বিষপানে নীলকণ্ঠ আমাদের সে বিষপান প্রাণনাশক বা আত্মহত্যার কারণ। যে বিদ্যুৎ লইয়া খেলা করা বৈজ্ঞানিকের ভূষণ, সেই বিদ্যুৎই আবার অশিক্ষিতের প্রাণনাশের হেতু। যে কাজ ভাব বা কথা জ্ঞানী তেজস্বী ও শক্তিমানের শোভা, সেই কাজ ভাব বা কথাই অজ্ঞানী ও কাপুরুষের পক্ষে বিশেষ নিন্দনীয়। যাহা বীরকে ভোগ দান করে তাহাই কাপুরুষকে বাঁধিয়া রাখে। যে আত্মা অসংযতের শত্রু সেই আত্মাই সংযতের পরম মিত্র। যে জগৎ বীরের আনন্দের উপাদান সেই জগৎই কাপুরুষের আসক্তির দুঃখের প্রধান কারণ। যে মায়া জীবকে কষ্ট দেয় সেই মায়াই আবার শিবের সেবা করে। যাহা সিদ্ধাবস্থায় আনন্দ বর্দ্ধন করে তাহাই সাধন অবস্থায় দুঃখের কারণ হয়। যে ইন্দ্রিয় অসাধককে নরকের পথে লইয়া যায়, সেই ইন্দ্রিয়ই আবার সাধককে ভগবৎদর্শনে ভগবৎতত্ত্ব আস্বাদনে সাহায্যে করিয়া তাহার পরম কল্যাণ সাধন করে। সাধন ও সিদ্ধাবস্থায় সাধনপ্রণালী বিধিব্যবস্থা

কেন এত ভিন্ন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। যাহা সিদ্ধাবস্থায় করণীয় তাহাই কেন অসিদ্ধাবস্থায় বর্জ্জনীয়, তাহা সাধক ছাড়া অন্যে বুঝিতে পারে না। এই সাধন ও সিদ্ধাবস্থার সমস্ত বিধানগুলি যে প্রকৃতির বিধানেরই অন্তর্গত তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

ঋষিরা প্রকৃতির অনেকগুলি স্তর দর্শন করিয়াছেন। তাহা প্রত্যেক স্তরের জন্য পৃথক পৃথক বিধান দৃষ্ট হইলেও আসলে লক্ষ্য বিষয়ে কোন ভেদই লক্ষিত হয় না। প্রকৃতি তামসিক স্তরের বিধানগুলি তামসিক লোকদের পক্ষে, রাজসিক স্তরের বিধানগুলি রাজসিক লোকদের এবং সাত্ত্বিক স্তরের বিধানগুলি সাত্ত্বিক লোকদের পক্ষে হিতকারী। বিষ্ঠা শূকরের খাদ্য—শূকরের খাওয়ায় কেহ আপত্তি করিবে না; কিন্তু দেবতারা খাইতে গেলেই যত গোলমাল। বাঘ-ভালুক মানুষ খায়, তাই বলিয়া ঋষিমুনিদের হিংসা করিতে গেলে চলিবে না। রাজা-মহারাজাদের সম্পূর্ণরূপে অহিংসা-ধর্ম্ম পালন করিতে বলিলে শূকরকে বিষ্ঠা বাঘকে মানুষ খাইতে নিষেধ করিলে কর্ম্মবিভ্রাট উপস্থিত হইবে। প্রকৃতি গুণ-বিভাগ, গুণজনিত জীববিভাগ ও গুণজনিত খাদ্যবিভাগ দ্বারা আপনার সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। বৃক্ষাদি যে জিনিস গ্রহণ করে মানুষ তাহা ত্যাগ করে, আবার মানুষ যাহা গ্রহণ করে বৃক্ষাদি তাহা ত্যাগ করে। এই আদানপ্রদানের ভিতর

প্রকৃতির মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সুন্দরভাবে পরিলক্ষিত হয়, অথচ 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরং অবাপ্স্যথ' পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের কল্যাণ সাধিত হইয়া যায়। এই আদানপ্রদানের ভিতর দিয়া প্রত্যেক জীবের কল্যাণ সুচারুরূপে সাধিত হইতেছে। জলচর মৎস্যগুলির ও স্থলচর মানুষগুলির দেহভেদ কার্য্যভেদ ধর্ম্মভেদ অস্বীকার করা যায় না, যদিও ইহারা সকলেই প্রকৃতির এক মহাবিধানের মহান ধর্ম্মের অন্তর্গত। ঋষিগণ গুণ-কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা জাতিভেদের রহস্যের মধ্য দিয়া এই প্রাকৃতিক ভেদকে ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ'—তাঁহাদের এই বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের তথ্যের মধ্যে অনেকটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি আমরা দেখিতে পাই। জ্ঞানের অভাবে সংস্কারের দোষে এখন সে সব প্রাকৃতিক বিধান এতই অপ্রাকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার ভিতর দিয়া ইহার উৎপত্তির মধ্যেও অনেকে নানারূপ কল্পনাজল্পনা করিয়া ঋষিদের উপর পর্য্যন্ত দোষারোপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। ঋষিরা ছিলেন প্রকৃতির শিশু, প্রাকৃতিক বিধানগুলিই ছিল তাঁহাদের ধর্ম্মবিধান। তাঁহারা প্রকৃতির তালে তালে চলিয়া প্রকৃতিরই সাহায্যে প্রকৃতির অন্তরাত্মা সেই মহান পরম ব্রহ্মের কাছে গিয়া উপস্থিত হইতেন। আমরা যে কারণেই হউক একান্ত অপ্রাকৃত হইয়া পড়িয়াছি। তাই প্রকৃতির শিশুদের প্রকৃতির

বিধানসম্মত ধর্ম্মরহস্যগুলি বুঝিয়া উঠা আমাদের কাছে একটা কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। সুস্থ অবস্থার ও অসুস্থ অবস্থার কাজ ভাব ও বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় এবং লক্ষিত হওয়াই যে স্বাভাবিক। যাহা লঙ্ঘন করা যায় না তাহা আবার কি করিয়া লঙ্ঘিত হয়? যে বিষয় আমার হাতে নাই সে বিষয় আমাকে করিতে বা না করিতে বলা বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রকৃতির বিধান অমোঘ, আবার বলিতে বাধ্য হইয়াছি প্রকৃতির বিধান মতে চলা উচিত—না চলিলে দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য! এ যে মহা গোলযোগের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ গোলযোগ গীতাদি ধর্ম্মগ্রন্থে পর্য্যন্ত দৃস্ট হইয়া থাকে। তবে এ গোলযোগের মূল গীতাতে নাই, যে গীতা বুঝিতে পারে নাই তাহার বুদ্ধিতে অবস্থিত। বুঝিতে না পারিলে গোলযোগ, বুঝিতে পারিলেই শান্তি। গীতার প্রথম স্তরে বলা হইল, কর্ত্তব্য কর ধর্ম্মানুষ্ঠান কর 'যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ'। দ্বিতীয় স্তরে বলা হইল, প্রকৃতিই সব করিতেছেন 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ'। ইচ্ছা না থাকিলেও প্রকৃতি তোমার হাত ধরিয়া সব করাইয়া লইবেন 'অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ'। তৃতীয় স্তরে বলা হইল তুমি উদাসীন হও, কর্ম্ম কর্ম্মের সংস্কার, কর্ম্মের আসক্তি তোমাকে যেন স্পর্শ করিতে না পারে, বুঝিতে চেষ্টা কর প্রকৃতির

উদ্দেশ্য সেই উত্তম পুরুষের ইচ্ছা পূরণ করা—উত্তম পুরুষের আনন্দ বর্দ্ধন করা। তুমি শুধু দ্রষ্টা। দর্শনশাস্ত্র বিশেষতঃ সাংখ্য এই তত্ত্বই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রথম স্তরে রহিয়াছি আমরা সাধারণ জীব, যাহারা প্রকৃতির স্বরূপ ও কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে অনেকটা অজ্ঞ। ভালর জন্যই হউক আর মন্দের জন্যই হউক আমাদের ভিতরে অহংতত্ত্বটা অনেকটা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা সকল কাজেই নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত। যে পর্য্যন্ত প্রকৃতি তাঁহার স্বরূপ তাঁহার কার্য্যপ্রণালী আমাদের ভাল করিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া না দিবেন, সে পর্য্যন্ত আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিব না যে আমাদের এই অহংকার শুধু একটা নকল কর্ত্তা, ইহার পিছনে প্রকৃতি দেবীই আসল কর্ত্তা রূপে বিদ্যমান থাকিয়া সমস্ত কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। এই নকল কর্ত্তা আসল কর্ত্তার একজন সামান্য কর্ম্মচারী মাত্র। "তৎ যথা অমাত্যানাং রাজ্ঞঃ সমবায়ে পারতন্ত্র্যং ব্যবায়ে স্বাতন্ত্র্য-মিতি"। গৌণ কর্ত্তা যে পর্য্যন্ত মুখ্য কর্ত্তা হইতে দূরে থাকে মুখ্য কর্ত্তার স্বরূপ ও কার্য্যপ্রণালী না জানে, সে পর্য্যন্তই সে স্বতন্ত্র স্বাধীন বলিয়া আপনাকে অনুভব ও আপনার মহিমা প্রচার করে; কিন্তু যখনই সে মুখ্য কর্ত্তার প্রকৃত রাজার সম্মুখীন হয় তখনই নিজের ও রাজার স্বরূপ ও কার্য্যপ্রণালী পরিজ্ঞাত হইয়া নিজে যে কর্ত্তা নহে তাহা বেশ করিয়া বুঝিয়া

লইতে পারে। যে পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃতির তত্ত্ব না জানিব সে পর্য্যন্ত আপন কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব ও অস্বাভাবিক! যতক্ষণ দেওয়াল দেখিতেছি ততক্ষণ দেওয়াল নাই বলিলে চলিবে কেন? কুকুর দৌড়াইতেছে বালক খেলিতেছে যুবা হাসিতেছে, এসব দেখিয়াও কি করিয়া বলিব ইহারা কিছুই করিতেছে না? ইহাদের পিছনে অপর কোন কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাকে আমরা দেখিতে পাই নাই। যে পর্য্যন্ত সেই কর্ত্তা এবং তাঁহার কার্য্যপ্রণালী বিশেষভাবে আমাদের নজরে না আসিবে আমাদের নিকট অপ্রত্যক্ষীভূত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত শুধু গায়ের জোরে তাহাকে টানিয়া আনিয়া মানুষকে জোর করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা জ্ঞানের উন্নতির সহায় নহে। এজন্য প্রথম স্তরের সাধারণ লোককে বলিয়া দেওয়া হইল, তোমরাই যখন নিজেকে নিজে কর্ত্তা মনে কর, তোমরা যখন নিজের ইচ্ছামত তোমাদের কার্য্যপ্রণালী চালাইতে পার বলিয়া বিশ্বাস কর, তখন এমনভাবে কার্য্য কর যাহাতে তোমাদের উন্নতিলাভ কল্যাণসাধন আনন্দপ্রাপ্তি সহজ হইয়া পড়ে। প্রকৃতির তত্ত্বগুলি অনুসন্ধান করিতে থাক। প্রকৃতি তোমাদের কত হিতৈষী তাহাতো দেখিয়াছ। তাঁহার বিধান মত চলা যে কতটা উন্নতির সহায় ও আনন্দের অনুকূল তাহাও তো বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। এইভাবে বুঝাইয়া কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির বিধান মতে চালাইয়া আস্তে আস্তে প্রকৃতির স্তরগুলি

ভেদ করিয়া প্রকৃতির যাবতীয় পরিণামের মধ্য দিয়া প্রকৃতির 'প্রকাশকমনাময়ম্' সাত্ত্বিক অবস্থার সামনে গিয়া সাধককে উপস্থিত করা হইল। সাধক তখন প্রকৃতির রহস্য বিশেষভাবে বুঝিতে আরম্ভ করেন। প্রকৃতির বিধানগুলি কতটা মঙ্গলসাধনে তৎপর তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পড়েন। তখন নিজের অহং-তত্ত্বের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধটা উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করে, ব্যষ্টি-সমষ্টির কল্পিত ভেদভাব আপনা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে, প্রকৃতির সমস্ত পরিণতিগুলি সুন্দরভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তখনই সাধক বুঝিতে পারেন যে তাঁহার অহং-তত্ত্বটি প্রকৃতির বিকারে কল্পিত ব্যষ্টি-পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধক তখন দেখিতে পান প্রকৃতিই সব করিতেছেন, কাজগুলি সব ব্যষ্টি দেহের ভিতর দিয়া আপনা হইতেই প্রাকৃতিক বিধান মতে কৃত হইয়া যাইতেছে। জলবিন্দু জলেরই বিন্দু, জলের বুকের উপর হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া খেলিয়া জলেরই স্রোতের সঙ্গে মহাসাগর পানে ছুটিয়াছে। তাহার উৎপত্তি জল হইতে স্থিতিও জলে আবার লয়ও পাইবে সেই জলেরই ভিতরে। যত কিছু দ্বন্দ্বভাব যত কিছু কামনা বাসনা আসক্তির লহরী যত কিছু কর্তৃত্বাভিমান যত কিছু ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত সংস্কার, তাহা শুধু স্থলবিশেষের অবস্থাবিশেষের পূর্ণ পরিণতির অনুকূল কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে। জলের বিন্দু জলেরই সঙ্গে জলেরই ধর্ম্মবিধান মতে চলিতেছিল। এখন সে

যদি নিজেকে সমস্ত জলরাশি হইতে পৃথক মনে করিয়া সমষ্টি জলরাশির চালক মনে করিয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠে, তখন তাহাকে বোকা বই আর কি বলা যাইতে পারে ? সাধক তখন নিজের অহংকারের অবস্থা কতকটা অনুভব করিয়া বুঝিতে পারেন যে, সমস্ত প্রকৃতি—প্রকৃতিসমুদ্র অনন্ত লহরী তুলিয়া তাহার কিরূপ অনন্ত লীলা বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। কেন যে প্রকৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে তখন যেন তাহা বেশ সুন্দররূপে সাধকের হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রকৃতিই যে সমস্ত করা-না-করা হওয়া-না-হওয়ার কর্ত্তা 'প্রকরোতি যা সা প্রকৃতিঃ'। এই অবস্থায় সাধক সাধন-রাজ্যের দ্বিতায় স্তরে পৌঁছিয়া থাকেন। 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥" এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ তখন বেশ বুঝিতে পারা যায়, 'গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে' কেন বলা হইয়াছে তাহাও অনুভবে আসে।

এখনও কিন্তু সাধকের সাধনা সম্পূর্ণ হয় নাই। প্রকৃতি কেন যে এসব কাণ্ডকারখানা লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাঁহার কাজের যে কি উদ্দেশ্য, এখনও তাহা সাধকের নজরে পড়ে নাই। এই অবস্থায় প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া তাহার লক্ষ্য মূল উদ্দেশ্য আস্তে আস্তে সাধকের নজরে পড়িতে আরম্ভ করে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে প্রকৃতির যত কিছু কার্য্যকলাপ উহা তাহার নিজের জন্য নহে, তাহার অন্তরাত্মা পুরুষ চৈতন্যের নিমিত্ত। তাঁহারই সত্তা চৈতন্য

ও আনন্দ প্রকৃতির ভিতরে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকৃতির সব স্তরগুলি ভেদ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছে। তখনই ধরা পড়িল কে প্রকৃতিকে চালায়, কে প্রকৃতির নিয়ামক, কার তৃপ্তির জন্য কার মঙ্গলের জন্য প্রকৃতির এসব বিচিত্র লীলা—আশ্চর্য্য পরিণতি ! তখনই সাধক পৌঁছেন গিয়া আপনার স্বরূপে উদাসীন অবস্থায়। এই অবস্থায় প্রকৃতির কোনও গুণজনিত কর্ম্ম তাঁহাকে আর স্পর্শ করিতে পারে না। এই অবস্থাকে সিদ্ধাবস্থা বলে। তখনই সাধক সিদ্ধ—প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব প্রকৃত বীরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ভাগবতে কৃষ্ণকে পূর্ণ অবতার বলা হইয়াছে। তিনি যে অন্ততঃ এই গুণাতীত সিদ্ধাবস্থায় ছিলেন তাহাতে ঋষিদের কোনও সন্দেহ ছিল না। 'তেজীয়সাং ন দোষায়' কথা দ্বারা সে অবস্থায় অবস্থিত কৃষ্ণচন্দ্র যে মায়াবিম্ব হইয়া অবিদ্যা বশীকার পূর্ব্বক ঈশ্বরত্বলাভ করিয়া প্রকৃতির দোষ-গুণের উপরে উঠিয়া গিয়াছিলেন তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। 'মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ'। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রকৃতির বিধান অমোঘ। আমরা যে প্রকৃতির বিধান লঙ্ঘন করিয়া শাস্তি ভোগ করি, তাহাও প্রকৃতির বিধানেরই অন্তর্গত। আমাদের গতি যদি ঠিক ভাবে প্রকৃতির তালে তালে নির্ব্বাহিত হইতে থাকে, তাহা হইলে আমাদের পূর্ণ পরিণতিলাভ অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। প্রকৃতির সমস্ত স্তরগুলিরই পৃথক পৃথক ধর্ম্ম

ও কর্ম্ম ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, জীব যখনই প্রকৃতির তালে তালে নাচিতে নাচিতে মনুষ্যের স্তরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই প্রকৃতির অহং-তত্ত্বের কর্ত্তৃত্বাভিমান জীবেরই কল্যাণের জন্য আনন্দ আস্বাদনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে যেন একটু বিরোধ করিতে আরম্ভ করিয়া এই বিরোধের ফল আস্বাদ করিয়া প্রকৃতিতে প্রকৃতির অন্তরাত্মায় আত্মনিবেদন-তত্ত্বকে সার্থক করিয়া তোলে। মার কোল হইতে ছেলে যে আলাদা হয় তাহাও তো মারই ইচ্ছায়, মাকে একটু বেশী করিয়া পাইবার জন্য। এই আমিত্ব ফুটিয়া বাহির না হইলে লয়-কাজটা—আত্মনিবেদন জনিত শান্তি উপভোগটা সার্থক হয় না। বৈষ্ণব সাধকগণ মান-লীলার ভিতর দিয়া এই তত্ত্ব আস্বাদ করিয়া থাকেন। মনুষ্যজীবনে অহং-তত্ত্ব প্রকৃতি হইতে নিজেকে একটু আলাদা মনে করিয়া আপন মহিমায় বিকশিত হইয়া প্রকৃতির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকে। বীজে যাহা বিদ্যমান গাছে তাহাই পরিণত হয়, সুতরাং এই অহং-তত্ত্বের অনুভূতি বাল্যকাল হইতেই উপলব্ধি হওয়া কতকটা স্বাভাবিক। 'আমার' 'আমার' ভাবটা ছেলেদের ভিতরে বেশ সুন্দর ভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়। 'আমার' কথাটার মধ্যে যে 'মার' কথাটা পূর্ণভাবে বর্ত্তমান, 'আ'টা যে একটা কাল্পনিক উপসর্গ, মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া আমাকে মা হইতে

পৃথক মনে করাইয়া একটা কাল্পনিক স্বাধীনতা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। বালকের স্বাধীনতা অনেকাংশে পরিণতির অনুকূল, কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। সে যদি সাপ ধরিতে চায়, ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িতে চায়, নিজের গলা কাটিতে চায়, অন্যের গলা কাটিতে চায়, তবে তখন তাহার স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া যে তাহার কল্যাণের জন্য একান্ত আবশ্যক তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ঋষিগণ দেখিয়াছেন পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বালকদের স্বাধীন প্রবৃত্তি বিশেষভাবে মারাত্মক রূপ ধারণ করে না। এই জন্যই বোধ হয় চাণক্য বলিয়াছেন 'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি'—পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বালককে অনেকটা স্বাধীনভাবে চলিতে দিতে হইবে। ইহার পরে বালক যখন স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকে বরণ করিতে বসিবে, সংযমের গণ্ডীর বাহিরে গিয়া নিজের বা সমাজের বিশেষ অমঙ্গলের কারণ হইতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাকে সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে একটু একটু শাসন করা আবশ্যক হইয়া পড়িবে। এই যে শাসন, ইহাও তাহার পরিণতির অনুকূল হওয়া চাই। প্রাকৃতিক নিয়মপালনে ভগবৎবিধান মতে চলায় যে কত সুখ কত শান্তি লাভ করা যায়, ইহা যে মুক্তিলাভের প্রকৃত স্বাধীনতালাভের কত সহায়, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ঋষিগণ স্বাধীনতা খুব ভাল বাসিতেন, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতাকে জীবনের মহান অনিষ্টের কারণ জানিয়া

তাহা হইতে ছেলেমেয়েদেরে রক্ষা করিতে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। যে গাছকে আজ বেড়া দিয়া রক্ষা না করিলে ছাগাদি পশু নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে, সেই গাছই যত্নে সুরক্ষিত হইলে যে প্রকাণ্ড হাতীকেও তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা যায় তাহা তাঁহারা বেশ সুন্দরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। সংযমে শক্তিলাভ ব্রহ্মচর্য্যে বীর্য্যলাভ একাগ্রতায় সিদ্ধিলাভ, ইহা যে প্রাকৃতিক্ নিয়ম—ইহার ব্যভিচারে যে মহতী বিনষ্টি হয় ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই ষোল বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদেরে সময়বিশেষে আবশ্যকবিশেষে কতকটা তাড়না করা শাসন করা সংযত করা একান্ত আবশ্যক মনে করিতেন। 'দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ' কথাটা এই ভাবেরই পরিপোষক। 'লালনে বহবোঃ দোষাঃ তাড়নে বহবো গুণাঃ। তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ নতু লালয়েৎ।" এই শ্লোকটিও প্রকৃত স্বাধীনতার প্রকৃতির বিশেষ পরিণতিলাভে বাধা দেয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়া বালক-বালিকাগণ প্রকৃতির তালে তালে কি ভাবে ফুটিয়া উঠিত, কি ভাবে ভাল কাজ করিতে কল্যাণের পথে চলিতে তাহারা অবাধ গতি লাভ করিত, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন।

প্রাচীন ঋষিরা ছিলেন প্রকৃতির অবিকৃত সন্তান। প্রকৃতির বিধানগুলি তাঁহারা প্রকৃতি হইতে শিখিতেন স্বাভাবিক উপায়ে, আপনা হইতে প্রকৃতির বিধানগুলি পালন করা হইয়া যাইত; সেজন্য তাঁহাদের বেশী একটা চিন্তা-চেষ্টার আবশ্যক হইত না। প্রকৃতির সন্তানদের সঙ্গে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের সঙ্গে তাঁহারা বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া যাইতেন। আশ্রমের হরিণ শিশুগুলি ছিল যেন তাঁহাদের ভাইবোন। পশুগুলিও তাঁহাদের প্রাণের ভাব প্রেমের বিকাশ বুঝিতে পারিত বলিয়া তাঁহাদেরে আদৌ ভয় করিত না, ভালবাসিয়া কাছে যাইত আদর-সোহাগ পাইত। এভাবে থাকার ফলে তাঁহারা অহি-ভেক-কচ্ছপাদির নিকট যোগের অনেক তত্ত্ব শিখিয়াছিলেন। কূর্ম্মাসন গরুড়াসন সর্পাসন, প্রাণায়ামাদি তাহার নিদর্শন। এই যে বহুদিন পর্য্যন্ত যোগীদের মাটির মধ্যে বা জলের মধ্যে অবস্থানের কথা শুনা যায়, ইহাও তাহাদেরই নিকট হইতে শিক্ষা করা

প্রকৃতির শিক্ষা

হইয়াছিল। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলাইয়া (in tune হইয়া) বাস করিবার সময় এই জাতীয় অনেক গূঢ় রহস্য তাঁহাদের ভিতর হইতে স্বাভাবিক বিধানে ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে। পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া যুক্ত হইয়া মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া থাকার নামই তো যোগ। যাহা দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় তাহা যেমন যোগ, সেইরূপ, যে কোনও উপায়ে তাঁহার সঙ্গে একবার যুক্ত হইয়া গেলে তখন আপনা হইতে যে ভাবে সব ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করে তাহাও যোগ।

বেদের সব শ্রুতিগুলিই ঋষিরা তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া আবিষ্কার করিতেন। প্রকৃতির রাজ্যের সব নিয়মপ্রণালী বিধান-রহস্য তাঁহাদের ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইত। প্রকৃতির অন্তরাত্মা সেই সচ্চিদানন্দের সত্তা চৈতন্য ও আনন্দই প্রকৃতির সব স্তরগুলি ভেদ করিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইতে চেষ্টা করে। প্রকৃতি যত সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ও স্বচ্ছ প্রকাশও তত বেশী। সাধনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন হইয়া ঋষিরা ভগবানের চিৎবিভূতিরূপ বেদ আবিষ্কার করেন। সেই বেদের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে লইয়াই তো আমাদের সব দর্শন-শাস্ত্র ব্যস্ত। ঋষিরা কি ভাবে কোন্ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন দর্শন করিয়া উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাহা ঠিক সেই ভাবে যিনি যতটা দর্শন ও বর্ণন করিতে

পারিবেন তাঁহার দর্শন-শাস্ত্র তত মূল্যবান মনে হইবে। সাধকগণ ঋষিগণ ব্রহ্ম ও মায়ার প্রকৃতি ও পুরুষের লীলাকে লীলাবিশেষকে দর্শন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজের ভিতরে আনিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়া তারপর আবার তাহাকে কথায় শ্রুতিরূপে ভাষায় কাব্যরূপে কার্য্যে শিল্পরূপে বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। গুণত্রয়-বিভাগের তারতম্য অনুসারে যে হিন্দুদের যুগবিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বোধ হয় বিশ্বাস কর। সত্যযুগটা সত্ত্বগুণ-প্রধান, ত্রেতা সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান, দ্বাপর রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান, কলি তমোগুণপ্রধান। হিন্দুগণ যে ভগবানেরও একটা গুণাতীত ভাব আর একটা আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভাবের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহা বোধ হয় মনে আছে। সত্যযুগের লোকদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানটা বেশী ছিল, আধ্যাত্মিক তত্ত্বনিরূপণে তাই তাঁহারা বেশী ব্যস্ত থাকিতেন। ত্রেতায় আধিদৈবিক ও দ্বাপরে আধিভৌতিক ভাবের দিকে লোকের নজর বেশী পড়িতে আরম্ভ করিল। তমঃপ্রধান কলিযুগে লোকেরা একেবারে স্থূলদর্শী হইয়া ভগবানকে অনেকটা বাদ দিয়াই রাখিয়াছে। সত্যযুগে আত্মায় আত্মায় ভাব-বিনিময়ের প্রথা বেশী ছিল। সাধকরা সহজেই বৈখরী মধ্যমা ও পশ্যন্তী আবরণ ভেদ করিয়া সব জিনিসেরই স্বরূপের কাছে আত্মার কাছে বেশী সহজে যাইতে পারিতেন। এই যুগটা শ্রুতিপ্রধান, প্রকৃতি হইতে

আত্মতত্ত্ব স্বরূপতত্ত্ব-দর্শনই সাধনা ছিল। ত্রেতায় আধ্যাত্মিক রাজ্য যেন একটু চাপা পড়িল, তাই শ্রুতির প্রাধান্য থাকিলেও স্মৃতির চর্চ্চা আরম্ভ হইল। এসময়ও মনের ভাব বোঝা মনে মনে ভাব-বিনিময় করা তত কঠিন ছিল না। তারপর দ্বাপরে তমের আবির্ভাবে ভিতরটা যেন অনেকটা চাপা পড়িয়া গেল, তাই সত্যযুগের অনুভূতিকে ভাষায় ও কারুকার্য্যে প্রকাশ না করিলে বাহির হইতে ভিতরের ভাব আর তত সহজে কেহ বুঝিতে পারিত না। প্রথম যুগের আধ্যাত্মিক ব্রহ্মভাব দ্বিতীয় যুগে আধিদৈবিক দেবতা-তত্ত্বে পরিণত হইল। তৃতীয় যুগে সে সব অনুভূত সত্যগুলি কাব্যরূপে মূর্ত্তিরূপে বাহিরে প্রকাশ পাইল। এখন যে আমরা স্থূল চোখে না দেখিলে স্থূল কানে না শুনিলে কিছুই বুঝিতে পারি না, বিশ্বাস করিতেও রাজি হই না।···আসল কথা প্রকৃতির পরিণতি।

তামসিক পরিণতিতে সব স্থূলভাবাপন্ন হইতে চেষ্টা করে, সাত্ত্বিক পরিণতিতে ভিতরে আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি ফুটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করে। এই সব কাজে প্রকৃতির হাতই যে খুব বেশী তাহা প্রকৃতির নগ্ন শিশু ঋষি-মুনিরা বেশ সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।...'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' 'গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে' শ্লোকগুলি স্মরণ কর।···'সুখেনৈব ভবেৎ যস্মিন্ অজস্রং ব্রহ্মচিন্তনং আসনং তৎ বিজানীয়াৎ নাজস্রং সুখ-নাশনং' এটাও যে শঙ্করের প্রকৃতিদর্শনের ফল বলিয়াই মনে

হয়। সব বিষয়ে স্বাভাবিক হইতে চেষ্টা করাই যে সাধনা। আমরা এখন একেবারে অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছি। ধর্ম্ম বাস করে স্বভাবে, সুতরাং তাহার অভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাও যে কতকটা অস্বাভাবিকই মনে হয়।

হরিদ্বার—১৯০০

সংসারশিক্ষক

সংসারটা সৃষ্টি হইয়াছে ভগবানকে প্রকাশ করিতে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতে। সংসারের সব জিনিসই সর্ব্বদা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে, আমরা অহংকারের বশে সে শিক্ষা হইতে পদে পদে বঞ্চিত হইতেছি। আমি গীতা-পাতঞ্জল পড়িয়াছি গঙ্গা ও হিমালয়ের কাছে, জীবনের সার শিক্ষা লাভ করিয়াছি আকাশ গাছ শিশু ও পাখী হইতে। শৈশবে পদ্মানদী আমাকে যে শিক্ষা দিয়াছিল সেজন্য আমি তাহার নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞ। যখন আমার বয়স নয় বৎসর তখন একদিন ছোট মামার সঙ্গে পদ্মাতীরে যাই। তিনি স্নান করিতে নদীতে নামিলেন। আমি

তখন তাঁহার কাপড় হাতে করিয়া তীরে দাঁড়াইয়া আছি। দেখি কি, যে তুফান মামাকে ও অপর সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে; আমি উপরে রহিয়াছি বলিয়া সে আমার পা ধোয়াইয়া দিতেছে। তখনই মামাকে বলিলাম, "আজ আমার জীবনের লক্ষ্য ঠিক হইয়া গেল ; আমি সংসার হইতে একটু উপরে উঠিয়া থাকি, তাহা হইলে সংসার আমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না, বাঁধিতে পারিবে না, কাছে আসে তো সেবা করিবে আমার পা ধোয়াইয়া দিয়া যাইবে।" বলা বাহুল্য, পদ্মার ঐ শিক্ষাটী আমাকে গীতার উদাসীন অবস্থা বুঝিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। বাবা যখন শেষবার কাশী যাইবার সময় আমাকে সন্ন্যাস লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান, তখন ছেলেবেলার একথাটা আমার খুব মনে হইতেছিল।

একদিন একটী ছেলে আমার সঙ্গে বেড়াইতে যাইবার জন্য কান্না আরম্ভ করিল। ঠিক হইল, সে আমার সঙ্গে যাইবে। তখন তার কাকা ভিতরে গিয়া বলিল "বৌদি, খোকাকে কাপড় পরিয়ে দেও ; খোকা স্বামীজির সঙ্গে বেড়াতে যাবে।" তখন খোকার মা বলিলেন "খোকা এখন কাপড় পরতে শিখেছে কাপড় পরতে পারে, তাই আমার আর তাকে কাপড় পরিয়ে দিতে হয় না।" মার কথাটা আমার কি রকম প্রাণে লাগিল। তাহার ভিতর দিয়া আমি যেন জগন্মাতার আমার উপর একটা আদেশ শুনিতে পাইলাম। "খেতে শিখলে আর খাওয়াবে

না, হাঁটতে শিখলে আর কোলে করবে না; নিজে ভাবতে শিখলে আর তুমি ভাববে না"। আচ্ছা, আজ হতে আমি আর আমার নিজের ভাবনা ভাবিব না, নিজের খাবার পরিবার থাকিবার চেষ্টা করিব না—দেখি, তুমি আমার জন্য সব ব্যবস্থা না করিয়া কি করিয়া ঠিক থাক! বলিব কি, আমার জীবনের সব ঘটনার মধ্য দিয়া ভগবান দেখাইয়া দিয়াছেন, তিনি আমার জন্য কত ব্যস্ত, আমাকে সুখে না রাখিলে যেন তাঁর চলে না। আমার জীবনের সমস্ত শান্তির আনন্দের মূল হইয়াছে আমার এই বিশ্বাসটী। বলতো সেই মা'টির নিকট আমি কত কৃতজ্ঞ!

আগে আমি খুব বেড়াইতে ভালবাসিতাম। স্কুলে থাকিতেই আমি একবার পদব্রজে কলিকাতা হইতে কাশী বেড়াইয়া গিয়াছি। অপরবার নোয়াখালি হইতে পদব্রজে চন্দ্রনাথ আদি সব দেখিয়া আসিয়াছি। আর একবার নারায়ণগঞ্জ হইতে হাঁটিয়া আসাম হইয়া কুচবিহার রংপুর নাটোর পর্য্যন্ত গিয়াছি। এই বেড়ানর মধ্যে আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল আমার ভগবান্ আমার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করেন তাহা নিজে প্রত্যক্ষ করা। অনেক সময় মনে ভাবিতাম পদব্রজে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিব। ভগবান একদিন এক আশ্চর্য্য কৌশলে আমার সব ভ্রমণস্পৃহা দূর করিয়া দিলেন। একটী ছেলের খুব ক্ষুধা পাইয়াছে। মার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা ভাত হয়েছে? মা তখন দুটি ভাত টিপিয়া

বলিলেন, একটু বাকী আছে। পাঁচ মিনিট পরে আবার দুটী ভাত টিপিয়া ঠিক করিলেন, ভাত হইয়াছে। ঘটনাটী আমার কি রকম প্রাণে লাগিয়া গেল। মা দুই-তিন সের চালের মধ্যে তিন-চারিটি ভাত টিপিয়া দেখিয়া সমস্ত ভাতের অবস্থা জ্ঞাত হইলেন, আর আমি এতগুলি দেশ দেখিয়াও সমস্ত পৃথিবী দেখার কাজ করিয়া লইতে পারিব না! বলা বাহুল্য, সেদিন হইতে আমার ভ্রমণস্পৃহা যেন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

একদিন একটী মাকে শান্তভাবে সমস্ত গোলমালের মধ্যে বসিয়া একান্তমনে রুগ্ন ছেলের সেবা করিতে দেখিয়া শিখিয়াছি যে, সংসারের সমস্ত গোলমালের মাঝখানেও কি করিয়া শান্তভাবে কাজ করা যায়। কালীমূর্ত্তি দেখিয়া শিখিয়াছি শিবত্ব ব্রহ্মত্ব-লাভের উপায় কি, কালীর তাণ্ডবলীলার মধ্যে শিব কিভাবে 'শান্তম্ অদ্বৈতম্' হইয়া অবস্থিত।

শিখিতে চেষ্টা করিলে সকলের নিকটই শিখিবার বিষয় আছে।

জীবনে দুঃখ অনুভব করিবার সুযোগ পাই নাই। ভগবৎ-কৃপা দিয়া তিনি এমন ভাবে আমার সমস্ত জীবনটী পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি যেন তাঁহার সৃষ্টির মাঝে কোথাও দুঃখের পাপতাপের সয়তানের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি না। ইহারা বাস করে আমাদের অজ্ঞানতায়, ইহারা অনুভূতিতে আসে আমাদের ব্যবহারদোষে, প্রাকৃতিক বিধান ভগবৎবিধান লঙ্ঘনের ফলে। যখনই দেখিতে পাই সে সব দুঃখ কষ্টও আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য আনন্দধামে লইয়া যাইবার জন্য, তখন আর যেন প্রাণে আনন্দ ধরিয়া রাখা যায় না!

বন্ধন

অনেকের মতে প্রকৃতি বন্ধনের কারণ, আমি কিন্তু সে সব কথা মানি না। আমার মনে হয় প্রকৃতি যখন ভগবানের শক্তি তখন প্রকৃতি নিশ্চয়ই আমার মুক্তির সহায়। প্রকৃতির মধ্যে যেমন সত্ত্বগুণ আছে তেমনি রজোগুণ ও তমোগুণ আছে তাহাও আমি মানি। তমোগুণ আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক—তমোগুণ সত্যকে ঢাকিয়া রাখে প্রকাশে বাধা দেয়, সে কথাও আমি মানি। কিন্তু বাধা দেয় কাহাকে? যাহার কল্যাণের জন্য বাধা দেওয়া দরকার তাহাকে। যে প্রকৃতি অনধিকারীর কাছে

সব গোপন রাখিতে চান, সেই প্রকৃতিই যে আবার উপযুক্ত অধিকারীর নিকট সব তত্ত্ব প্রকাশ করিতে মহা ব্যস্ত। যাহার ভিতরে ঘোর তমোভাব লুকাইয়া আছে তাঁহারই তামসিক অনুষ্ঠানের সহায় হইয়া রোগ শোক তাপ আদির মধ্য দিয়া তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা দান করিয়া সৎপথে চালিত করিবার জন্যই যে প্রকৃতি চেষ্টাশীল।

ব্যভিচারের ভীষণ পরিণতি তুমি জান না, ব্যভিচারের কুফল সম্বন্ধে পড়িয়া শুনিয়া তোমার কিছুতেই হুঁস হইতেছে না, অথচ তোমার ভিতরে ব্যভিচারের বীজ বিশেষভাবে বর্ত্তমান। এ অবস্থায় তুমি ঐ সব মলিনতা চাপা দিয়া যে নিজের ও অপরের সমধিক অনিষ্ট করিবে প্রকৃতি তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই তখন তোমারই মঙ্গলসাধনের জন্য প্রকৃতি তোমার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কতকটা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া কতকটা ভোগের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া, ব্যাধি লোকনিন্দা আদির সাহায্যে তোমাকে কুকাজের কুপরিণাম প্রত্যক্ষভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া তোমার চিত্তভূমি হইতে পাপের বীজ সমূলে উৎপাটিত করিয়া তোমার বিশেষ কল্যাণ-সাধনে সমর্থ হইলেন। যার চোখ নাই সে দেখিবে না, তুমি আমি আর তাহার কি করিতে পারি? আমি তো প্রকৃতিকে পরম কল্যাণকারিণী মঙ্গলময়ী জননীরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমার হৃদয়ে তাঁহার আসন বিছাইয়া রাখিয়াছি। জানিয়াছি প্রকৃতি

মহামায়া যোগমায়াই সাধনরাজ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সহায়। আমাদের শরীররক্ষার জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রকৃতির চেষ্টা ও কার্য্যপ্রণালী, মনকে স্থির ও পবিত্র করিয়া রাখিবার জন্য প্রকৃতির চেষ্টা ও যত্ন, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার ফলরূপে শাস্তিবিধানের ব্যবস্থার মধ্য দিয়া আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা দেখিয়াই বোধ হয় প্রাচীন হিন্দুগণ মহামায়ার এতটা ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিকৃতিই বন্ধনের কারণ এবং বিকৃতি প্রকৃতিরই তমো-গুণের রজোগুণের কার্য্যের ফল; এজন্য লোকে প্রকৃতির ঘাড়ে যত দোষ চাপায়। রোগ দুঃখ কষ্ট যে আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তার পরে মনে রাখিতে হইবে অনধিকারীর পক্ষে সামাজিক বন্ধন রাজনৈতিক বন্ধন কত ইষ্টসাধন করিয়া থাকে। ঐ সব বন্ধনও যে মুক্তির দ্বার তাহা বুঝিতে হইবে। শাস্ত্র যে-সংসারকে বন্ধনের কারণ বলিয়া ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, সে সংসার এই দৃশ্যমান জগৎ নহে, সে সংসার রহিয়াছে আমাদের ভিতরে কামনা বাসনা আসক্তিরূপে। 'বাসনা এব সংসারস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে' 'যত্র যত্র ভবেৎ তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তত্তদা' প্রভৃতি শ্লোকগুলির মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা কর। লোকের চোখে ঘোর সংসারী রাজর্ষি জনক অতুল ঐশ্বর্য্যের ভোগের মধ্যে থাকিয়াও শুক প্রভৃতি আদর্শ সন্ন্যাসীদের গুরু ছিলেন। রাম

কৃষ্ণ শিব আদি সগুণ ব্রহ্মের মূর্ত্তি বলিয়া যাঁহারা সমাজে পূজিত, তাঁহারাও যে সংসারী ছিলেন।

......বলিতে পার, পতঞ্জলি ঋষি সংসারের সব পদার্থকে বিবেকীর নিকটে দুঃখের কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ মনে রাখিও বিবেকীর নিকটে এসব দুঃখের কারণ— প্রেমিক ভক্তের নিকট নহে। তাঁহারা যে জগৎকে ব্রহ্মময় বলিয়া দেখিতে শিখিয়া জগৎকে আনন্দঘন-মূর্ত্তিরূপে অনুভব করিয়া থাকেন! পাতঞ্জল "পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈগুর্ণবৃত্তি-বিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ" বলিয়া গিয়াছেন একথা আমরা অস্বীকার করি না। জগতে যে পরিণামের ঢেউ দেখিয়া বিবেকিগণ ভয়ে অস্থির হন, ভক্ত প্রেমিক সেই সব পরিণামকে ভগবৎবিভূতি ভগবৎলীলাজ্ঞানে তাহাদিগকেও আনন্দস্ফুরণের সহায় মনে করেন। যে তুফানকে জলের তুফান বলিয়া জানিয়াছে, তুফান জলের বুকে উঠে নাচে লয় হয় বলিয়া অনুভব করিয়াছে, সে আর তুফানে ভয় পায় না। গাছটী বীজের পরিণাম হইলেও গাছই যে বীজকে পরিণত করে সফল করে সার্থক করে, এ তত্ত্বটা বুঝিতে পারিলে এসব পরিণতিতে ভয় না পাইয়া ইহাদিগকে আনন্দবৃদ্ধির সহায়রূপে গ্রহণ করাই স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। জন্মের মধ্যে যেমন অনেক দেখিবার আছে মৃত্যুর মধ্যেও তেমনি অনেক শিখিবার আছে। আমরা গড়িবার আনন্দে অভ্যস্ত; ভাঙ্গিবার আনন্দে অনভ্যস্ত বলিয়াই,

তো আমরা মৃত্যুকে তাঙ্গাকে এতটা ভয় করিয়া থাকি। জ্ঞানীর কাছে সমাধিও যা জাগ্রৎলীলা-অবস্থাও তাই ; শান্ত সমুদ্র যেরূপ সুন্দর, তরঙ্গায়িত সমুদ্রও তেমনি সুন্দর ! এই উভয়রূপের মধ্য দিয়া সেই অরূপীর রূপসাগরে তাঁহারা বিভোর থাকেন। সুতরাং ঐ সব 'সূত্র' প্রেমিককে ব্যথা দিতে পারে না।

* * *

সুখ

আমরা সুখ সুখ বলিয়া সকলেই উন্মত্ত কিন্তু সুখের প্রকৃত তত্ত্বটী উপলব্ধি করিতে কেহই বিশেষ চেষ্টা করি না। অভাব-পূরণে যে একটা তৃপ্তিবোধ হয় তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। টাকা নাই—টাকার অভাবে কি করিয়া চলিবে ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলাম, টাকার অভাব-বোধটা একান্তভাবে আমাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিল, অমনি টাকা রোজগারের জন্য ছুটিলাম। এই টাকার জন্য যত রকমের চেষ্টা করিবার তাহা করা হইল, যাহা করা উচিত ছিল না তাহাও করিতে বাধা হইল না—শরীর খারাপ করিলাম

মন খারাপ করিলাম কত লোককে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলাম, কত ছল কত কপটতা কত মিথ্যা কথা প্রভৃতি অবৈধ উপায় দ্বারা অর্থসঞ্চয় করিলাম—অর্থাভাব জনিত অতৃপ্তি দূর হওয়ায় কতকটা আরামও পাইলাম, কিন্তু অর্থের পিপাসাটা তো মিটিল না! অধিকন্তু এই অর্থের উপার্জ্জনের জন্য যতটা অনর্থের আশ্রয় লইয়াছিলাম তাহার ফল তাহার স্মৃতি আরও যেন কষ্টের কারণ হইয়া পড়িল। সমস্ত অভাবপূরণ সম্বন্ধেই প্রায় একরূপ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বিষয় লইয়া বিচার করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, দুই রকমের অভাব আছে—একটা প্রকৃত, একটা কল্পিত। যেটা প্রকৃত অভাব সেটা হইতেছে স্বভাবের আত্মভাবের প্রকৃত স্বরূপের ভাবে বর্ত্তমানতার ভগবৎনির্দ্ধারিত কার্য্যসাধনে বাধাবোধ হইতে সমুৎপন্ন। এই অভাববোধটা আমাদিগকে উৎসাহিত করে উত্তেজিত করে প্রেরিত করে ভগবৎইচ্ছা-পূরণে, প্রকৃতির কার্য্যসাধনে কোথায় বাধা পড়িয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া সে বাধা দূর করিয়া প্রকৃতির কাজে ভগবৎ-ইচ্ছাপূরণে সহায় হইতে। এই বাধাপূরণের চেষ্টাও আবার প্রকৃতভাবে ধর্ম্মানুমোদিতভাবে ও অপ্রাকৃতভাবে ধর্ম্মের প্রতিকূল-ভাবে সাধিত হইতে পারে। এক কথায় সাত্ত্বিকভাবে অথবা রাজসিক ও তামসিক ভাবে আমরা এই অভাব দূর করিতে পারি। সাত্ত্বিক ভাবটা 'প্রকাশকমনাময়ম্' বলিয়া

প্রকৃতির অনেকটা অনুকূল ভগবৎইচ্ছার অনুমোদিত বলিয়া কথিত, সুতরাং সেখানে আমাদের বাধা পাইবার সম্ভাবনা কম। রাজসিক তামসিক উপায়গুলি অনেকাংশে বিঘ্নসমাকুল। কল্পিত অভাবগুলি প্রকৃত নয় স্বরূপগত নয়, ভগবৎইচ্ছার সহানুভূতি আমরা সেখানে দেখিতে পাই না। যাহা কল্পিত যাহা অসত্য তাহা যে অনাবশ্যকীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; সুতরাং সে কাজে ভাললোকের প্রাকৃতিক নিয়মের ভগবৎবিধানের সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক, প্রতিকূলতার আশা করাই সুবিবেচনার কার্য্য। কল্পিত অভাবগুলি দূর করিতে গিয়া আমরা আরও অনেক অভাব-অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া বসি, কতকগুলি অনাবশ্যক বোঝার ভারে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। যেটা স্বাভাবিক ক্ষুধা, সেটা সাত্ত্বিক অন্ন দ্বারা সাত্ত্বিকভাবে দূর করিলে আমরা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া সুখলাভ করিতে সক্ষম হই; আর যেটা অস্বাভবিক ক্ষুধা, সেটা নিবৃত্তি করিতে গিয়া আমরা রোগ-শোক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হই। এই যে খাবার দেখিলেই খাইতে ইচ্ছা, ইহা পেটুকতার পরিচায়ক—এই ইচ্ছা দুঃখকষ্টকে আহ্বান করে ডাকিয়া আনে। সমস্ত অভাবের মধ্যেই আমরা প্রকৃত ও কল্পিত এই দুইজাতীয় ব্যাপার দেখিতে পাই; সুতরাং অভাববোধ হইলেই যে তাহা পূরণ করিতে হইবে সে কথা আমরা বলিতে পারি না। এই বোধ হওয়াটা ঠিক কি অঠিক তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। যাহার ইন্দ্রিয় সংযত চিত্ত শুদ্ধ ও

শাস্ত্র, তাহার বোধটা সাধারণতঃ প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। চঞ্চলচিত্তের কল্পনাজল্পনা তাহার স্বাভাবিক অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় না। যাহা আমাদের প্রকৃত অভাব দূর করিয়া আমাদিগকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাহাই আমাদিগকে সুখ দান করিয়া থাকে, যাহা অস্বাভাবিক যাহা অপ্রাকৃত যাহা কল্পিত যাহা অসত্য, তাহা সুখ-অন্বেষণকারী মাত্রেরই একান্তভাবে পরিত্যাজ্য। প্রকৃতির কাজে যাহা বাধা দেয় ভগবৎইচ্ছাপূরণে যাহা বিঘ্ন আনয়ন করে, দর্শন-শাস্ত্র তাহাকেই ব্যাধি দুঃখ অনর্থ আদি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

জগৎটা কম্পনাত্মক। কতকগুলি কম্পন আত্মবিকাশের পূর্ণতালাভের সহায়, আর কতকগুলি কম্পন আত্মবিকাশের পূর্ণ পরিণতিলাভে বাধা দেয়। যাহা আত্মবিকাশের অনুকূল তাহাই সুখ, যাহা আত্মবিকাশের প্রতিকূল তাহাই দুঃখ। এই বাধা-বিঘ্ন-জনিত দুঃখকে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই ত্রিবিধ দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তিকেই মানুষের পরম পুরুষার্থরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। দুঃখকে এমনভাবে নিবৃত্ত করিতে হইবে যাহাতে সে আর পুনরাবৃত্ত হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে না পারে, আবার এমনভাবে নিবৃত্ত করিতে হইবে যাহা হইতে বেশী নিবৃত্তি আমরা কল্পনায়ও আনিতে

অক্ষম। সুখস্বরূপ রসস্বরূপ প্রেমস্বরূপ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা স্বপ্রকাশ, আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে খ্যাপন করিতে বিকাশ করিতে ফুটাইয়া বাহির করিতে মহাব্যস্ত। যাহা তাঁহার প্রকাশে বাধা দেয় তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাই ব্যাধি তাহাই বিঘ্ন তাহাই অনর্থ তাহাই দুঃখের কারণ। "নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়, অনর্থ নিবৃত্তি হ'লে প্রেমের উদয়"। সূর্য্যের স্বভাবই প্রকাশ পাওয়া, মেঘ তাহাকে ঢাকিয়া রাখে আমাদের সূর্য্যদর্শনে বাধা দেয়; কোনও কারণে মেঘ অপসারিত হইলে সূর্য্যদেব আপন মহিমা বিস্তার করিতে সক্ষম হন। ভগবান তাঁহার প্রিয় জীবের নিকটে আপন মহিমা আপন বিভূতি প্রকাশ করিতে মহা ব্যগ্র, জীবকে তাঁহার আনন্দধামে ডাকিয়া লইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। জীবের মোহনিদ্রা—কামনা বাসনার পরদা দূর হইলেই তাঁহার আকর্ষণ কার্য্যকর হইতে পারে। ইহারই নাম ভগবৎকৃপা, ইহাই জীবের এক মাত্র সম্বল, ইহাই জীবের ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এই ব্যাধি দূর করা অনর্থ নিবৃত্তি করা বাধা-বিঘ্ন অজ্ঞানতা অপসারিত করাই তো যত সাধন-ভজনের মূল কারণ। সুখলাভ করিতে হইলে শান্তিতে বাস করিতে হইলে আমাদিগকে ভগবৎপ্রাপ্তির প্রকৃতির বিধানের অনুকূল ভাবে চলিতে হইবে, যাহা কিছু প্রতিকূল তাহা বাদ দিতে হইবে। প্রকৃত সুখলাভের আর অন্য রাস্তা নাই, ভগবৎ-

সকাশে ভগবৎআনন্দধামে পৌঁছিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। অভাব যেমন প্রকৃত ও কল্পিতভাবে দ্বিবিধ, অভাবনিবৃত্তির উপায় সাধনা এবং ফল অর্থাৎ সিদ্ধিও সেইরূপ প্রকৃত ও কল্পিতভাবে দ্বিবিধ হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে কল্পিত মানে একেবারে মিথ্যা নয়—যেমন জগৎটা ব্রহ্মের কল্পনা, যেমন আমাদের দেহাদি কল্পিত, ইহা কতকটা সেই ভাবের। পারমার্থিক সত্তা প্রকৃত, আর ব্যবহারিক সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তা কল্পিত। পারমার্থিক ভাবে দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা পারমার্থিক সুখলাভের সহায়, ব্যবহারিক ভাবে ব্যবহারিক উপায় দ্বারা সুখলাভের চেষ্টা ব্যবহারিক সুখলাভের উপায়। সুখ-শব্দের মধ্যে আমরা এইজনা এই দ্বিবিধ ভাব দ্বিবিধ রূপই দেখিতে পাই। ভগবান যাস্ক সুখ-শব্দের লক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন "সুখং কস্মাৎ? সুহিতং খেভ্যঃ, খং পুনঃ খনতেঃ"—নিরুক্ত ভাষ্য। "সু হিতং সুষ্ঠু হিতমেতৎ খেভ্যঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ। খং পুনঃ ইন্দ্রিয়ং খনতেঃ ধাতোঃ"—দুর্গাদাস। "অতিশয়েন হিতং বা পুরুষে আত্ম-ধর্ম্মত্বাৎ সুখাদীনাং ধর্ম্মাধিকরণত্বাৎ ধর্ম্মিণাং। খং পুনঃ খনতেঃ; উৎপূর্ব্বাৎ উৎখনতি বিনাশয়তি, কিম্? পরব্রহ্মপ্রাপ্তি-সুখং, কথম্? কায়সুখপ্রবৃত্তেরধোগমনাৎ ইতি সুখম্।"—দেবরাজ যজ্ব॥ খ-মানে ইন্দ্রিয়। খ-হেতুক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জন্য, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগজনিত মনোবিকারবিশেষ।

ইহার নাম সুখ, এই সুখ ব্যবহারিক সুখ; ইহা পরব্রহ্মপ্রাপ্তি-সুখকে খনন করে নাশ করে আবৃত রাখে। অন্য সুখ পুরুষ বা আত্মার যাহা ধর্ম্ম, আনন্দময়েব যাহা স্বভাব, রসস্বরূপের যাহা বিকাশ; তাহাই আধ্যাত্মিক সুখ তাহাই প্রকৃত সুখ। এখন এই দ্বিবিধ সুখের স্বরূপটা একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। নির্গুণ ও স্বগুণ ব্রহ্ম ভাবিতে গেলে আমরা গুণাতীত অব্যক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তাঁহার জগৎরূপে ব্যক্তভাবে অভিব্যক্তিও দেখিতে পাই। এক শিব-তত্ত্ব অপর শক্তি-তত্ত্ব; এক প্রণবাত্মক অর্দ্ধমাত্রা, অপর অকার-উকার-মকাররূপে তাহার অভি-ব্যক্তি। পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টি করেন নির্গুণ সগুণ হন, তাঁহার নিজকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজকে নিজে আস্বাদ করিবার জন্য। জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' জগৎকে তাঁহার ভাবে ভাবিত করেন, তাঁহার গায়ের গন্ধ মনের ভাব আনন্দস্বরূপ গুণ-তারতম্যে জগতে অনুপ্রাণিত করিয়া দেন। জগৎ তাই অনেক অংশে তদ্ভাবে ভাবিত। পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ তাই তাঁহার আনন্দের গন্ধ আমরা জগতে জাগতিক পদার্থে দেখিতে পাই। "এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"। জগতে আমরা যত কিছু আনন্দ যত কিছু সুখ দেখিতে পাই তাহা সেই ব্রহ্মানন্দেরই মাত্রা, অখণ্ড ব্রহ্মানন্দের মায়াকল্পিত গুণবৈষম্যজনিত কল্পিত খণ্ডাবস্থা। তাঁহারই প্রেম তাঁহারই আনন্দ

স্ত্রী-পুত্র মা-বাপ ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজনদের ভিতর দিয়া মধুর বাৎসল্য সখ্য দাস্য শান্তাদিরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাঁহারই প্রণব-বংশীধ্বনি সা রে গা মা পা ধা নি আদি সপ্তস্বর-রূপে জগতে বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। আব্রহ্ম কীটাদি জীব তারতম্যভাবে ব্রহ্মানন্দ-লবকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। "তারতম্যেন বর্ত্তন্তে ব্রহ্মানন্দলবাশ্রয়াঃ"। আমাদের প্রকৃত সুখের কারণ আত্মা, তিনি রহিয়াছেন সহস্রারে—'নিহিতং গুহায়াং'। আমাদের মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সেই আনন্দময়ের আনন্দের ছায়া লইয়া আনন্দ বিতরণ করিতেছে—আনন্দ আস্বাদ করিতেছে! আত্মা আনন্দস্বরূপ তাই যে যতটা আমাদের আত্মীয় আত্মসম্বন্ধীয় সে আমাদের ততটা আনন্দের কারণ হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন এই যে, পুত্র স্ত্রী ধন আদি আমাদের এত প্রিয়, ইহা পুত্রের জন্য স্ত্রীর জন্য ধনের জন্য নহে—এ সবও আত্মারই জন্য। "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি" ইত্যাদি সবই আত্মার জন্য প্রিয়। মানুষ মাত্রেই সুখের জন্য পাগল, কিসে সুখ কোথায় সুখ বলিয়া

ইতস্ততঃ পাগলের ন্যায় ঘুরিতেছে। সে যাহা সুখের উপাদান মনে করে তাহার প্রতি ধাবিত হয়। মানুষ মানুষের মন সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে যাহাকে সুখের কারণ মনে করে তাহাকে লাভ করিতে তাহাকে কাছে রাখিতে তাহাকে আপনার করিয়া লইতে তাহাকে আত্মীয়ভাবে পাইতে চেষ্টা করে। পাছে কেহ লইয়া যায় এই ভয়ে সে তখন অস্থির হয়, যথাসম্ভব সাবধানে যথাসম্ভব নিজের কাছে রাখিতে চেষ্টা করে। এই-ভাবে সুখের উপাদানকে নিজের কাছে নিজের ভিতরে লইয়া যাইতে চায়। যতক্ষণ উহা দূরে থাকে ততক্ষণ মনটা যেন দূরে তার কাছে গিয়া পড়িয়া থাকে, জিনিসটা যত কাছে আসে মনটাও তার সঙ্গে সঙ্গে ততটা কাছে আসিয়া আত্মার নিকটে উপস্থিত হয়। এইভাবে সুখের উপাদানের সাহায্যে আমাদের বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হইতে আরম্ভ করে। চিত্ত যত অন্তর্মুখী হইতে থাকে ততই স্বাভিমুখদর্পনে প্রতিবিম্বপাতের ন্যায় সুখময় আত্মার প্রতিবিম্ব মনের উপর গিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে মন বিষয়ানন্দ-সুখ বিষয়প্রাপ্তি-জনিত আনন্দ উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে। চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখী হওয়ায় চিত্তের বৃত্তির নিরোধপরিণামের ফলে জীবাত্মার স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হওয়ায় আত্মা তখন ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দে বিভোর হইয়া পড়ে। বাহিরের অবোধ লোক মনে করে বিষয় বুঝি তাহাকে আনন্দে বিভোর করিয়া দিয়াছে। রামচন্দ্রের চিত্ত

সীতার চিন্তায় বিভোর, সীতার নিকট ছুটিয়া যাইতে সচেষ্ট। তাই সীতা যতক্ষণ রামচন্দ্র হইতে দূরে ছিলেন ততক্ষণ রামচন্দ্রের মন তাঁহার আত্মা হইতে দূরে থাকায় আত্মানন্দানুভব সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া বিরহে কষ্ট পাইতেছিলেন। এখন সীতা যতই রামচন্দ্রের কাছে আসিতে আরম্ভ করিলেন, সীতার সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের মনও তত রামচন্দ্রের আত্মার নিকটে আসিতে আরম্ভ করিল; ইহার ফলে রামচন্দ্র তখন আত্মার সান্নিধ্য জনিত আনন্দে ততটাই বিভোর হইতে আরম্ভ করিলেন। সীতা যখন আসিয়া রামচন্দ্রকে স্পর্শ করিলেন, রামচন্দ্র তখন সমাধি-সুখে একেবারে বিভোর হইয়া গেলেন! সীতা যখন অন্যত্র গমন করিলেন তখনও রামচন্দ্রের আনন্দানুভূতি পূর্ববৎই রহিয়া গেল, সীতা যে চলিয়া গিয়াছেন তাহাও রামচন্দ্র অনুভব করিতে সক্ষম হইলেন না। সীতার সান্নিধ্য রামচন্দ্রের আনন্দের প্রকৃত কারণ হইলে তাঁহার অসান্নিধ্য রামচন্দ্রের আনন্দ কমাইয়া দিত। সুতরাং সীতা এখানে রামচন্দ্রের আনন্দলাভ বিষয়ে মুখ্য কারণ নহেন, গৌণ নিমিত্ত কারণ মাত্র। আনন্দের মূল কারণ মনের আত্মসান্নিধ্য। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি'তে আমরা ঠিক এই কথাই দেখিতে পাই—"বিষয়সুখমপি ন স্বরূপসুখাৎ অতিরিচ্যতে। বিষয়প্রাপ্তৌ সত্যাং অন্তর্মুখে মনসি স্বরূপসুখস্যৈব প্রতিবিম্বনাৎ। স্বাভিমুখে দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ববৎ।" কুকুর অভ্যাসবশে শুষ্ক হাড

চিবাইতে আরম্ভ করে। শুষ্ক হাড়ে রসকষ কিছুই বর্ত্তমান নাই। অতিরিক্ত চর্ব্বণের ফলে কুকুরের মুখ হইতে তখন রক্ত নির্গত হইতে আরম্ভ করে, কুকুর ভুলিয়া মনে করে হাড় হইতে বুঝি রক্ত নির্গত হইতেছে। কুকুরের এই আনন্দ-লাভকে বিষয়ানন্দ-লাভের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কঠোপনিষদেও দেখিতে পাই "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥" আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া যখন আত্মায় স্থিতি লাভ করে বুদ্ধিও তখন বহির্বিষয়ে ব্যাপৃত না না থাকিয়া বাহিরের বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে; সে অবস্থায়ই জীব পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। প্রকৃত সুখ ভিতরে আত্মার কাছে হইলেও বাহিরটা যখন ভিতরেরই বহির্বিকাশ, জগৎটা যখন আত্মারই বিভূতি, বৈষয়িক সুখের মূল কারণও যখন আত্মানন্দ, তখন আমরা বিষয়সুখকে স্বরূপসুখ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ মনে করিতে পারি না। তবে বিষয়সুখ যে উৎপত্তি-বিনাশশীল ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য পরিচ্ছিন্ন তাহাতে আমরা আর সন্দেহ করি না। নিত্য সুখ থাকে নিত্যকে সত্যকে অবলম্বন করিয়া, ব্যবহারিক সুখ থাকে ব্যবহারিক জগৎ ব্যবহারিক জগতের বিষয় লইয়া—এই মাত্র পার্থক্য। যাঁহারা জগৎকেই সার বলিয়া ধরিয়াছেন জগতের পরপারের কোনও খবর রাখিতে চান না খবর রাখিতে চেষ্টা করেন না,

তাঁহারা যে বিষয়সুখকে ব্যবহারিক সুখকেই চরম সুখ বলিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাঁহারা বিষয়ের বৈষয়িক সুখের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া পারমার্থিক সুখের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া তল্লাভে বদ্ধপরিকর হইয়া পড়িয়াছেন, বিষয়সুখ আর তাঁহাদিগকে কিছুতেই ভুলাইয়া রাখিতে সক্ষম হয় না। সংসারের স্বরূপ দেখিয়া জরা ব্যাধি মৃত্যুর অপরিহার্য্যতা স্মরণ করিয়া রাজকুমার বুদ্ধদেব সাংসারিক সমস্ত সুখকে দুঃখের কারণ মনে করিয়া একদিন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ' বলিয়া মহর্ষি পতঞ্জলি একদিন সংসারের সকল সুখকে দুঃখপূর্ণবোধে বিষমিশ্র অন্নকে বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। মহাভারতাদি-গ্রন্থেও আমরা সংসারসুখকে বিষবৎ সন্দর্শন করিতে উপদিষ্ট হইয়া থাকি। "শিরোর্দ্ধলম্বিত-খড়্গ-নরবৎ সভয়ং নৃপাঃ। যাপয়ন্তি সদা কালং মহারাজ্যেশ্বরা অপি॥ সুখকালে হি দুঃখস্য ভয়াদ্ধি সর্ব্বজন্তবঃ। তিষ্ঠন্তি শঙ্কিতাঃ সদা তস্মাৎ ভোগ্যং বিষান্নবৎ॥"—শান্তিপর্ব্ব। বধ্য ব্যক্তি যেমন উদ্যত শাণিত খড়্গভয়ে অধীর হয়, মহারাজাধিরাজও সেইরূপ সর্ব্বদা কালভয়ে ভীত হইয়া বাস করেন। সুখসময়েও সকল জন্তু দুঃখভয়ে শঙ্কিতভাবে বাস করে, এজন্য সংসারের সুখভোগকে

সাধুগণ বিষমিশ্রিত অন্নবৎ দুঃখের কারণ মনে করিয়া থাকেন।

সংসার সৃষ্ট হইল আনন্দময় আত্মাকে প্রকাশ করিবার জন্য আনন্দখ্যাপনের জন্য, জগৎটা হইল আনন্দের আনন্দময়ের বিলাসবিভূতি ; এখন সেই জগৎকে বিষবৎ দুঃখের কারণ বলিয়া ত্যাগ করিলে চলিবে কেন ? জগৎকে দুঃখময় মনে করা কি ঘোর নাস্তিকতা নয় ? জগৎটা যাঁর বিভূতি তাঁকে বাদ দিয়া জগৎভোগ করার ফল যে দুঃখময় এবং তাঁহাকে বাদ দেওয়াও যে অসম্ভব, বাদ দিতে চেষ্টা করাও যে নাস্তিকতা মূর্খতা, তাহা দেখানই শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। ওখানে দুঃখের উৎপত্তি যে অজ্ঞানতায় স্বরূপবিস্মৃতিতে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভুল অনুমান করায় তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। যাঁহারা ভক্ত যাঁহারা সাধক, যাঁহারা আনন্দময় রসস্বরূপ প্রেমস্বরূপ ভগবানের অন্বেষণ করেন, জগৎকে তাঁহারই বিভূতি বলিয়া মনে করেন গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অভিধানে জগৎটা আনন্দেরই বিকাশ, জগতে দুঃখকষ্টের অনুভূতিতে পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নহেন। তবে সমস্ত বিকাশের মূল প্রস্রবণের কাছে না গিয়া সমস্ত খণ্ড আনন্দের মধ্য দিয়া সেই পরম অখণ্ড আনন্দ পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়া তাঁহারা বিশ্রাম করিতে প্রস্তুত হন না। তাঁহাদের ক্ষুৎপিপাসাটা অত্যন্ত বেশী তাই তাঁহারা সহজে

নিবৃত্ত সহজে তৃপ্ত হইবার পাত্র নহেন। আসল কথা আত্মার স্বরূপাবস্থাই সুখ, আত্মার স্বরূপবিস্মৃতিই যত দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। আমাদের এই বৈষয়িক সুখ ব্যবহারিক জগতের পরিচিত সুখও সেই প্রকৃত সুখের আত্মানন্দের একটা সীমাবদ্ধ অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের সুখময় আনন্দস্বরূপ আত্মা পরমাত্মা আমাদের দেহ আমাদের জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন, এখন আবার সেই ব্যষ্টিসমষ্টি দেহ ও জগতের মধ্য দিয়া আপন সত্তা চৈতন্য ও আনন্দকে অবাধিতভাবে ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের কর্ম্ম আমাদের সংস্কার আমাদের কামনা বাসনা আসিক্ত তাঁহার প্রকাশে বাধা দিতেছে। যাহার চিত্ত যত শুদ্ধ ও শান্ত তথায় তাঁহার প্রকাশ তত বেশী, সেখানে আমরা তত অধিক আনন্দের সুখের বিকাশ দেখিতে পাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে আত্মার অবাধিত অবস্থাই সুখ, বাধিত অবস্থাই দুঃখ বা দুঃখের কারণ। সেই মহান বিভু আত্মাকে যে যতটা জানিয়াছে যে যতটা পাইয়াছে তার ততটা সুখ। 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি' সেই বৃহৎ ব্যাপী ব্রহ্মকে জানিয়া যে তন্ময় হইয়া গিয়াছে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে-ই প্রকৃত সুখ আস্বাদ করিতে সক্ষম হইয়াছে। 'ভূমৈব সুখং' প্রকৃত সুখ সেই ভূমার কাছেই বাস করে। পরমাত্মা সুখস্বরূপ, সুখ বাস করে

পরমাত্মার কাছে; সুতরাং যে যত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তাঁহাকে পাইয়াছে, সে তত সুখী। সেই সুখলাভের জন্যই যে, যত সাধন-ভজন যত উদ্যম-চেষ্টা। জগতে যে ব্যবহারিক সুখ দৃষ্ট হয় তাহারও মূল কারণ সেই পরমাত্মা পরমাত্মার বিকাশ ভগবানের সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের প্রকাশ, যদিও তাহার দ্রষ্টা ও ভোক্তারা সেই সুখের উপাদানের মধ্যে পরমাত্মার তত্ত্ব পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহে।

আমাদের দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি-ভেদে সুখের উপাদান বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। উচ্চ অধিকারীর সাত্ত্বিক অধিকারীর পক্ষে যাহা সুখকর, নিম্নাধিকারীর পক্ষে তামসিক জীবের পক্ষে তাহা সুখকর না হইয়া অনেক সময় দুঃখকর-রূপেই গৃহীত হয়। স্বর্গে বিষ্ঠা পাওয়া যায় না বলিয়া শূকর নাকি সেখানে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল! ধীবরকন্যা সম্রাটচক্রবর্ত্তীর সহিত পরিণীতা হইয়াও রাজার দুগ্ধফেননিভ শয্যায় মাছের গন্ধ না পাইয়া আরামে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। তার পরে আমাদের মানসিক অবস্থার উপরও অনেক সময় বৈষয়িক সুখ-দুঃখানুভূতি নির্ভর করে। 'তোমাতে যখন মজে আমার মন তখনই ভুবন হয় সুধাময়' গানটী তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে। রাধারাণী যখন কৃষ্ণবিরহে কাতরা তখন কোকিলের সুমিষ্ট ধ্বনি তাঁহার প্রাণে ভীষণভাবে আঘাত করিল, আবার যখনই কৃষ্ণচন্দ্র আগমন করিলেন অমনি 'আজু রজনী

হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়া মুখ চন্দা' বলিয়া সেই কোকিলকেই ডাকিবার জন্য রাধারাণী অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের ভিতরে প্রকৃতির সব স্তরগুলি বর্ত্তমান, তাহার সর্ব্বোচ্চ স্তরে সহস্রারে আনন্দময় পরমাত্মা পূর্ণভাবে বিরাজিত, আমাদের জীবাত্মা আমাদের মন এই সব স্তরে ভিন্ন ভিন্ন চক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যখন আমাদের মনটা অন্তর্মুখী হয়, তখনই সে অন্তরস্থ আত্মানন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করে; তার পরে সে যত আত্মার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই সে বেশী পরিমাণে আত্মানন্দ আস্বাদ করিতে থাকে, তখন যে সমষ্টি-প্রকৃতির ভিতরেও সে ততটা আনন্দ আস্বাদ করিতে সক্ষম হয়। যখন সে সহস্রারে ব্রহ্ম-ধামে গোলোকে গিয়া পৌঁছায় তখন আর তাহার আনন্দের সীমা থাকে না, তখন সে সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভব করিয়া ব্রহ্মানন্দ-সাগরে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া যায়। তখনই তো 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি', 'যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণ-স্তত্র দর্শনম্'।

এখন দেখা যাউক, সুখসম্বন্ধে আমাদের গীতা কি বলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে আমরা সর্ব্বপ্রথম সুখের সন্ধান পাই। বিষয়সুখ যে মাত্রা-স্পর্শা আগমাপায়ী, তাহা যে নিত্য সুখকে ঢাকিয়া রাখে তাহা বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। এই বৈষয়িক সুখ-দুঃখের স্রোতে যে অবিচলিত থাকিতে পারে সে যে অমৃতত্ব পরমানন্দ-

লাভে সক্ষম হয় তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। "মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥' এই শ্লোকদুইটী ভাবিয়া দেখ। তার পরে আমরা সুখের সন্ধান পাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে একাত্তর শ্লোকে "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥" এখানে কে প্রকৃত সুখের অধিকারী তাহা দেখান হইয়াছে। যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহভাবে বিচরণ করিতে সক্ষম, যে ব্যক্তির মমতা অহন্তা ভাব দূর হইয়া গিয়াছে, সে-ই প্রকৃত শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিষয়, এমন কি বিষয়জনিত সংস্কার থাকিতে যে শান্তি সুখলাভ অসম্ভব তাহা বেশ সুন্দরভাবে দেখান হইল। ইহার পরে চতুর্থ অধ্যায়ের চল্লিশ শ্লোকে 'ন সুখং সংশয়াত্মনঃ', এখানে চিত্তে সংশয় থাকিলে সংকল্প-বিকল্প থাকিলে যে সুখলাভের আশা করা যায় না তাহা দেখান হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের মনোনাশ সম্বন্ধে কথাগুলি এখানে স্মরণ করা উচিত। "প্রাণং মনো দ্বয়মিদং বিলয়ং নয়েৎ যঃ। মোক্ষং স গচ্ছতি নরো ন কথঞ্চিদন্যঃ ॥" প্রাণ ও মনের নাশ না হইলে যে মোক্ষলাভ হয় না দুঃখনিবৃত্তি হয় না তাহাও ভাবিবার বিষয়। ইহার পরে পঞ্চম অধ্যায়ে একুশ হইতে চব্বিশ শ্লোকে বেশ

সুন্দরভাবে সুখের স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। "বাহ্যস্পর্শেষ্ব-সক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং। স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥" 'বাহ্য সুখসংস্পর্শে যাঁহার আত্মা কিছুমাত্র আসক্ত নহে, তিনি কেবল আত্মাতেই সুখ অনুভব করেন; ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্তাত্মা সেই ব্যক্তি অমৃত-সুখ ভোগ করিয়া থাকেন।' প্রকৃত সুখ যে বাস করে আত্মায়, বাহিরের বিষয়ে অনাসক্তি না থাকিলে যে সে সুখ আস্বাদ করিবার উপায় নাই, তাহা আমরা এ শ্লোকে সুন্দরভাবে দেখিতে পাই। ইহার পরের শ্লোকে আরও সুন্দরভাবে বাহ্য সুখের স্বরূপ দেখান হইয়াছে। "যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ-যোনয় এব তে। আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।" 'বাহ্য বিষয়ের সংসর্গজনিত এই যে সকল সুখ, সে সমস্তই ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে; কারণ ঐ সকল সুখ আদি ও অন্তযুক্ত অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল। অতএব হে কৌন্তেয়, এইজাতীয় সুখে পণ্ডিতগণ কখনও আসক্ত হন না।' ইহার পরের শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি এই বৈষয়িক সুখস্পৃহা জয় করিতে সক্ষম সে প্রকৃত সুখ লাভ করিয়া থাকে। "শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ। কাম-ক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥" 'যিনি এই শরীর থাকিতেই কাম-ক্রোধজনিত বেগ সংবরণ করিতে পারেন অর্থাৎ বিষয়ে আসক্তি ও দ্বেষ জয়

করিতে পারেন, সেই মনুষ্যই যোগী তিনিই সুখী।' যোগ-বাশিষ্ঠ এ সম্বন্ধে আরও একটু বেশী দূর গিয়া বলিয়াছেন "প্রাণে গতে যথা দেহী সুখ-দুঃখে ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥" 'প্রাণ গত হইলে দেহী যেমন সুখ-দুঃখ বোধ করে না সেইরূপ অবস্থা যদি প্রাণ থাকিতে লাভ হয় তবে সেই ব্যক্তি কৈবল্য-সুখলাভে সক্ষম হয়।' এখন দেখা যাউক, এইভাবে বিষয়সুখকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ বিষয়সুখ হইতে অধিক মূল্যবান কিছু লাভ করিতে সক্ষম হয় কিনা। এখানে গীতা বলেন "যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥" 'যিনি সর্ব্বদা অন্তঃসুখে সুখী, অন্তরেই যিনি আরাম প্রাপ্ত হন অন্তরেই যিনি বিহার করেন অন্তরের ব্রহ্মজ্যোতিদর্শনে যিনি তন্ময়, তিনি ব্রহ্মরূপে পরিণত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়াও মানুষ সর্ব্বভূতহিতে রত থাকে, পঁচিশ শ্লোকের এই ভাবটী অতি সুন্দর। ইহার পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আটাশ শ্লোকে দেখিতে পাই ব্রহ্মসংস্পর্শ জনিত সুখই অক্ষয় সুখ। অন্যত্র দেখা যায়, রজোগুণ উপশান্ত হইলে অত্যন্ত সুখ-লাভ করিবার অধিকার জন্মে। ব্যবহারিক সুখ রাজসিক, প্রতিভাসিক সুখ তামসিক; আধ্যাত্মিক সুখ যে ইহার অনেক উপরে তাহা এখানে বেশ সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। ইহার পরে সপ্তম অধ্যায়ে একুশ শ্লোকে আত্যন্তিক সুখ

প্রকৃত সুখ যে অতীন্দ্রিয় শুধু বিশুদ্ধ-বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাহা বেশ সুন্দরভাবে দেখিতে পাওয়া যায় 'সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং'। উপনিষদের 'হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্‌৯প্তঃ' কথাটা স্মরণ কর। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' অর্থাৎ বাক্য মনের সহিত ব্রহ্মানন্দ-বর্ণনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই যে আনন্দ, ইহা লাভ করিবার একমাত্র উপায় চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করা। গীতার এসব শ্লোক হইতেও আমরা দেখিতে পাই যে প্রকৃত সুখ রহিয়াছে সুখময়ের কাছে, বিষয়সুখ যেন তাহাকে প্রকাশ করিতে সৃষ্ট হইয়াও কেমন করিয়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! এই বিষয়সুখের হাত হইতে এই বিষয়সুখের আসক্তি হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে আর আত্মানন্দলাভের আশা নাই। ইহার পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে সুখের ও গুণজনিত ত্রিবিধ ভেদের বর্ণনা করা হইয়াছে। "সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ। অভ্যাসাৎ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥" 'হে ভরতশ্রেষ্ঠ এখন তিন প্রকার সুখের বিবরণ শ্রবণ কর, যে সুখে মানুষ অভ্যাস বশতঃ আসক্ত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।' এখানে দেখা গেল মানুষ অভ্যাস বশে গুণজনিত সুখে আসক্ত হয় এবং তাহার ফলে অশেষ দুঃখভোগ করে। এই উপদেশ মানুষকে গুণাতীত সুখআস্বাদনে ব্রহ্মানন্দলাভে উৎসাহিত করিয়া থাকে। ব্যবহারিক সুখ জাগতিক সুখ যে প্রকৃত সুখ নয়.

তাহাও বেশ সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। "যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্। তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজম্॥" যাহা প্রথমে অতি বিষের ন্যায় কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য মনে হয়, যাহা আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজ তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। এখানে 'আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ' কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বুদ্ধির একদিকে আত্মা অন্যদিকে অনাত্মা বিষয়। সাধারণতঃ মানুষের বুদ্ধি বিষয় লইয়া এত বিব্রত যে পরমাত্মার দিকে একবারও মুখ ফিরাইবার তাহার সুযোগ জুটে না। সত্ত্ব-গুণোদ্রেকে সত্ত্বগুণের 'প্রকাশকমনাময়ম্' শক্তির প্রভাবে চিত্ত আত্মার স্বরূপদর্শনে আকৃষ্ট হইয়াছে আত্মার আনন্দাভাস আস্বাদনে লুব্ধ হইয়াছে, কিন্তু তবুও চিত্তের রাজসিক তামসিক ময়লা সমূলে দূরীভূত না হইলে আত্মানন্দ তাহাতে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে না। তাই বলা হইল বুদ্ধি যখন সমস্ত মালিন্য বিমুক্ত হইয়া আত্মপ্রতিবিম্ব-গ্রহণে সক্ষম হইয়াছে, তখন আত্মার আনন্দস্বরূপ শান্ত বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে সমাধি-সুখ উৎপাদন করে উপলব্ধি করে তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। এসুখ বিষয়জন্য নহে, ইহা আত্মপ্রসাদ আত্মবিকাশ হইতে লব্ধ। তার পরে "বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্। পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতং॥" 'যে সুখ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন, যাহা আগে অমৃতের ন্যায় পরিণামে বিষের ন্যায় কষ্টদায়ক তাহা রাজস সুখ।' এখানে

বিষয়জনিত সুখের স্বভাব ও পরিণাম দেখান হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান সভ্য জগৎ এই সুখের পিছনে তীব্রগতিতে প্রধাবিত। ইহার পরে তামসিক সুখ। "যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ। নিদ্রালস্য-প্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥" 'নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা এখন ও পরে আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই জন্মায় না, তাহাকে তামস সুখ বলিয়া জানিবে।' এই সুখ আবরণাত্মক তমোগুণ প্রভাবে আত্মার স্বরূপপ্রকাশে বাধা দেয়, আত্মাকে ঢাকিয়া রাখিয়া মানুষকে পাথরের ন্যায় উদ্যম-উৎসাহরহিত অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে। এ সুখ যে পরিত্যাজ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

মানুষ গুণ লইয়া খেলা করিতে গিয়া গুণে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যে গুণ যে গুণজনিত জগৎ সে তাহার খেলার জন্য লীলার ছলে সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ বুদ্ধির দোষে স্বয়ং তাহাতে আবদ্ধ হইয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে গুণ ছিল আনন্দের সহচর সে গুণ হইয়াছে এখন বন্ধনের কারণ, যাহা ছিল সুখের অনুকূল তাহা হইয়া পড়িয়াছে সুখের প্রতিকূল। যে মুক্ত হাওয়া আমাদের সুস্থশরীরে সুখের স্বাস্থ্যের সহায় ছিল, সেই হাওয়া এখন অসুস্থাবস্থায় আমাদের কষ্টের রোগের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। এখন যে পর্য্যন্ত আমরা সুস্থাবস্থা লাভ না করিতে পারি, যে পর্য্যন্ত আমরা

সমস্ত বিকৃতি বিরূপভাব দূর করিয়া স্বরূপপ্রতিষ্ঠ না হইতে পারি, সে পর্য্যন্ত আমাদের আর গুণগুলিকে গুণজনিত বিষয়-গুলিকে ঠিক ভাবে ভোগ করিবার অধিকার পাওয়া হইবে না। এজন্য আমাদের সংযমের সাধনা আবশ্যক, বিষয় হইতে দূরে গিয়া আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা আবশ্যক। অপরিপক্ক অবস্থায় বিষয়সুখ আমাদেরে কুপথে লইয়া যাইবে আমাদের অনিষ্ট করিবে, তাই মহাদেবের ন্যায় মদনভস্ম পার্ব্বতীর ন্যায় তপস্যা একান্ত আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য সাধনা ব্যতীত আদর্শ গৃহী হইবার অধিকার লাভ করা যায় না। আজকাল এ সব উপদেশ অনেকের প্রাণে কেমন একটা হতাশভাব বা বিদ্রূপের ভাব আনয়ন করে। পরিণত বয়সে আবার প্রথম হইতে যাত্রা আরম্ভ করা অসম্ভব। ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, যেমন যাহা হইয়া গিয়াছে যে সময় চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, সেইরূপ যে কাজ করা হইয়া গিয়াছে তাহার ফলটাও কতকটা না ভোগ করিলে চলে না। এখন হইতে সাবধান হইলেও অনেকটা সুফল আশা করা যাইতে পারে। যাঁহারা পূর্ণভাবে আনন্দ আস্বাদ করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে পূর্ণভাবে সংযম পূর্ণভাবে সাধনাও একান্ত আবশ্যক। যিনি যেজাতীয় সুখ যে পরিমাণে লাভ করিতে চান, তাঁহাকে সেইজাতীয় সাধন সেই পরিমাণে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যাঁহারা ব্যবহারিক সুখে

তৃপ্ত থাকিতে চান, তাঁহারা গুণজনিত সুখের গুণজনিত সাধনা লইয়া ব্যস্ত থাকুন। যিনি যে ভাবের সাধনা করিবেন তিনি সেই ভাবের ফল ভোগ করিবেন। আমরা কাজ করিব রাজসিক তামসিক ভাবের আর সুখ চাহিব সাত্ত্বিক ভাবের গুণাতীত ভাবের, ইহা যে যুক্তিবিরুদ্ধ অবৈজ্ঞানিক কথা পাগলের উন্মত্ত প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। "বিধির এমনি কল যে, যে যেমন কার্য্য করে তার তেমনি ফল"। বলিতে পার, জগতে ছল-কপটতার প্রভাবে স্বার্থসিদ্ধিও তো দেখা যায়—সাধকগণ কিন্তু সেখানেও কর্ম্মফলের অমোঘ ব্যবস্থা দেখিতে পান। ঐ সব লোক পূর্ব্বের সুকৃতিবলে সাময়িক প্রতিষ্ঠা সাময়িক সুখলাভে সক্ষম হইলেও উহাদের পরিণাম ভয়াবহ। "কতক্ষণ রহে ঢিল শূন্যেতে মারিলে?" সত্য সত্যরূপে মিথ্যা মিথ্যারূপে লোকে খ্যাত হয়ই। সন্দেহ নাই যে বর্ত্তমান সভ্য জগৎ অনেকটা রাজসিক সুখের পিছনে ধাবিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকের ভিতরে যে সাত্ত্বিক ভাব বিদ্যমান নাই তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ফল দেখিয়া কার্য্য অনুমিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য জগতের প্রতিষ্ঠা আধিপত্য ও সুখসম্ভোগ দেখিয়া তাহাদের কার্য্যের গুণাগুণ অনেকটা বিচার করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে আজকাল অনেক ঋষিকল্প সাধক দৃষ্ট হইয়া থাকেন,—জাতি হিসাবেও তাঁহারা রাজসিক সাধনা দ্বারা তামসিক ভারতবাসী হইতে অনেকটা

উন্নত ভূমিতে অবস্থিত ; নতুবা ভগবান তাহাদেরে এই উন্নত অবস্থালাভে সাহায্য করিতেন না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা একদিন খুব উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রক্ত এখনও আমাদের ধমনীতে বর্ত্তমান আছে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্য এখনও আমরা আমাদের ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে দেখিতে পাই। পূর্ব্বপুরুষের গৌরব এবং তাঁহাদের লিখিত শ্লোকগুলি মুখস্থ করিয়া এখনও আমরা তামসিক অবস্থায় সত্ত্বগুণের মহিমাপ্রচার দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি করিতে কম ব্যস্ত নহি ; কিন্তু এভাব আর বেশীদিন চলিবে না। ভগবানের কুরুক্ষেত্রে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমরা তামসিক কাজ লইয়া তামসিক ভাব লইয়া যেভাবে তামসিক আনন্দে বিভোর রহিয়াছি, আর সেই তামসিক আনন্দকে সাত্ত্বিক আনন্দ বলিয়া ভাবিতে বুঝিতে বুঝাইতে প্রচার করিতে যে ভাবে সচেষ্ট হইয়াছি, তাহাতে এজাতির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। ইহার শোধন না হইলে ধ্বংস অনিবার্য্য। পাশ্চাত্য জাতি রজোগুণের মধ্য দিয়া যে ভাবে চলিয়াছে তাহাতে আস্তে আস্তে সত্ত্বগুণে গুণাতীত অবস্থায় গিয়া স্বাভাবিক পরিণতিক্রমে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। ব্যবহারিক সুখের মধ্য দিয়া সাত্ত্বিক সুখের আত্মানন্দের আস্বাদ-প্রণালীটা ধরিয়া লইতে পারিলেই এই জাতি উন্নতিলাভে সক্ষম হইত। তন্ত্রশাস্ত্র এ বিষয়ে একদিন বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়া গিয়াছে। পঞ্চ মকারের তামসিক ভাবকেও সে সাত্ত্বিক ভাবে

পরিণত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগের পক্ষে তান্ত্রিক-তত্ত্ব তান্ত্রিক-সাধনা বিশেষভাবে উপযোগী বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যেও আমরা তন্ত্রের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকি। প্রাতিভাসিক সুখকে ব্যবহারিক সুখে পরিণত করিয়া, ব্যবহারিক সুখকে আস্তে আস্তে আধ্যাত্মিক সুখে পারমার্থিক সুখে পরিণত করিয়া ব্যবহারিক সুখের ভিতর দিয়া আত্মানন্দের বিকাশ আবিষ্কার করিয়া সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আত্মার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে নিশ্চয়ই আমরা একদিন আত্মানন্দলাভে সক্ষম হইব। জগৎ ভগবৎভাবে ভাবিত জগতের মধ্যে তাঁহার গায়ের গন্ধ পরাণের আশাগুলি চিত্তের আকর্ষণ-স্পৃহা বেশ সুন্দরভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। "পথেতে যেতে চলে মালাটি গেছে ফেলে পরাণের আশাগুলি গাঁথা যেন তায়—সে কেন চুরি করে চায়" এটা যে একটা মস্ত সত্য কথা। তাঁহার এই মালাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেই বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া আমরা যদি জগতের মধ্য দিয়া তাঁর দিকে অগ্রসর হইতে থাকি, তবে আমরা নিশ্চয়ই একদিন জগতের ভিতরে জগন্নাথকে দর্শন করিয়া বিষয়সুখের মধ্যেও ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে সক্ষম হইব। তবে যাহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের সাধন অবলম্বন করিয়া ভগবৎ-বিধান মতে অগ্রসর হইতে সক্ষম, তাহাদের সুখ যে চরম সীমা-লাভে সমর্থ হইবার সুযোগ পাইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

ব্রহ্ম নিজকে প্রকাশ করিবার জন্য আস্বাদ করিবার জন্য আস্বাদ্য করিয়া তুলিবার জন্য আপন মায়ার সাহায্যে যোগ-মায়ার সাহায্যে তপস্যা করিয়া বিচার করিয়া এক হইয়াও নিজকে অনন্তভাবে বিভক্ত করিয়া জীবজগৎ-রূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিতরূপে প্রতীয়মান হইতে বসিয়াছেন। ইহা লইয়াই তাঁহার সৃষ্ট্যাদি লীলারহস্য। এই কাজটির স্বরূপ দেখাইতে গিয়া ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন 'লীলা-চ্ছলেন ইব'। এই কাজটি যে তাঁহার লীলাখেলা, বাল-গোপালের স্বভাবচপলের লুকোচুরি-খেলার মত—ইহার উৎপত্তি আনন্দ-প্রাচুর্য্য হইতে আনন্দময়ের স্বভাব হইতে স্ব-ইচ্ছায়, কাহারও চাপে নয় কোনওরূপ অভাবের তাড়নায় নহে। আগুনের তাপ দেওয়া আলোর প্রকাশ পাওয়া যেমন স্বভাব, বালকের খেলা করাও যে তেমনই তাহারই স্বভাব। এই খেলার মধ্য দিয়া দেহাদির পরিণতির মধ্য দিয়াই বালক আপনাকে প্রচার করিয়া থাকে। এই সৃষ্ট্যাদি 'বালকের খেলাবিশেষ' হইলেও কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়—

সৃষ্টি-রহস্য

ইহার মধ্যে কোথাও বিচারে ভুল দেখা যায় না। ইহা সব বিষয়ে পূর্ণ, অনন্তদেবের অনন্ত বিচিত্রতার পরিপোষক। জ্ঞানীর বিচারে যতটা ভাল কল্পনায় আসিতে পারে তাহা অপেক্ষাও ভাল। বালগোপাল শুধু তো আনন্দময় নন তিনি যে আবার চৈতন্যময়ও; সুতরাং তাঁহার চৈতন্যবিকাশে জ্ঞানের প্রকাশে অপূর্ণতা থাকিবে কি করিয়া! এই পূর্ণতা সকলকে এক অবস্থায় উপনীত করাইয়া নয়—অনন্ত বিচিত্রতার মধ্য দিয়া অনন্ত স্তরের অনন্ত পরিণতির মধ্য দিয়া। তবে তাহার এই কাজটা জ্ঞানীর নিকট অনেকটা যেন ঐন্দ্রজালিক কৌশলের মত মনে হয়। বীজের ভিতরে গাছকে লুকাইয়া রাখা কারণের মধ্যে কার্য্যের অবস্থান যে বাস্তবিকই মানব-মনের ধারণার অতীত—ইন্দ্রজাল-ব্যাপারবিশেষ। তাহার পরে যিনি বিধান মত সাধনের সাহায্যে এই লীলা এই কৌশল প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি যেন কেমন একটা 'বাধির বোবা রসে ডোবা' হইয়া সৃষ্টি ও স্রষ্টার পার্থক্যগুলি ভুলিতে আরম্ভ করিয়া বিভক্তির মধ্যে অবিভক্তকে উপলব্ধি করিতে করিতে ধ্যেয় বস্তুতে তন্ময়তালাভ করিয়া এমন ভাবে ব্রহ্মে লীন হইয়া যান যে, তখন আর তাহার ভিতরে তিনি বিজাতীয়, স্বজাতীয় ও স্বগত-ভেদের কোন কারণই প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হন না। সে অবস্থায় তিনি ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তুর সত্তাই হৃদয়ঙ্গম করিবার কল্পনা করিবার সুযোগ পান না।

তাই তিনি তখন এই জগৎরচনাদি ব্যাপারকে 'ইব' রূপে উল্লেখ করিয়া বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কিছু সৃষ্টি হইয়াছে কিনা তাহাতেও সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেন। যাহা জ্ঞানের আলোতে ওঙ্কারে গিয়া লুকায়—অখণ্ড অদ্বৈতানুভূতিতে লয় পায়, আবার মায়ার প্রভাবে ব্যবহারিক ভাবে প্রাতিভাসিক সত্তায় বিবর্ত্তিত বা পরিণত হইয়া এমন সুন্দর ভাবে প্রতীয়মান হয়, তাহার মধ্যে যে মস্ত একটা সন্দেহের বিষয় 'ইব'-র খেলা রহিয়া যায় তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে!

সাধক প্রথমে অনুভব করেন একটা সৃষ্টির কারখানা, তখন তিনি স্বীকার করেন আরম্ভবাদ। তার পরে অনুভব করেন একটা আশ্চর্য্য পরিণতির স্বভাব—কতকটা নিজেই যেন আপন স্বভাবে অনন্তরূপে পরিণত হইতেছেন। আরও কাছে গিয়া দেখেন এই ভাবে পরিণত বলিয়া অনুভূতি হইলেও প্রকৃত তত্ত্ব অবিকৃত অপরিণতই থাকিয়া যায়—রজ্জু আর সর্পে পরিণত হয় না। ইহার পরের অবস্থায় পূর্ণভাবে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া মায়ার কল্পনার অতীত দেশে গিয়া তিনি এক ব্রহ্মসত্তা ছাড়া আর কিছুই যে অনুভব করিবার সুযোগ পান না। সৃষ্টি ও লয়-ক্রিয়াটা জন্ম ও মৃত্যুটা আসা যাওয়া উঠা নামাটার ভিতরে আমরা কেমন যেন একটা ঢাকা ও খোলার লুকোচুরি-লীলা দেখিতে পাই। ব্রহ্মই যেন একবার লীলার জন্য মায়ার চাদর গায় দিয়া জগৎরূপে জীবরূপে বিবর্ত্তিত পরিণত হইলেন, আর একবার স্বরূপে যাওয়ার

জন্য মায়ার চাদরখানা খুলিয়া ফেলিয়া এ সমস্তকে নিজের ভিতরে লয় করিয়া বসিলেন। একবার জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন তাহার মধ্যে লুকাইয়া গেলেন, আর একবার জগতের মধ্য দিয়া তাঁহার স্বরূপ তাঁহার সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ ফুটাইয়া বাহির করিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইহা একটা লীলাখেলা, কিন্তু সাধারণ জীবের নিকট ইহা একটা কর্ম্মভোগ। আমরা একবার স্রষ্টা হইতে যেন দূরে যাই আবার তাঁহার কাছে আসি। অজ্ঞানী দূরে গিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া সংসারে মজিয়া কষ্টভোগ করে, জ্ঞানী তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী জানিয়া তাঁহার বিধানে তাঁহারই লীলার সহায় হইয়া আনন্দ ভোগ করে। এই আসাযাওয়া-তত্ত্বটিকে মিলটন (Milton) স্বর্গচ্যুতি (Paradise Lost) এবং স্বর্গলাভের (Paradise regained) মধ্য দিয়া ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের পুরাণগুলির মধ্যেও আমরা ভগবৎপার্শ্বদগণের দ্বারপালবিশেষের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া শাপগ্রস্ত হইয়া দেবলোক ছাড়িয়া মর্ত্তধামে আসিয়া অসুররূপে জন্মগ্রহণের কথা শুনিতে পাই। অহংবশে ভগবৎবিধান অমান্য করা আর আমিত্ব-বোধে লজ্জাবোধে স্বর্গীয় সরলতা ভুলিয়া ব্যবহারিক জ্ঞানফল আস্বাদ করা প্রায় একজাতীয় কথা। এই অসুরগণ যে ভাবে ভগবৎকৃপায় পুনরায় মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া যায় তাহাও মিল্টনের স্বর্গপ্রাপ্তিরই অনুরূপ। বলরামের মায়া

দেখিতে গিয়া মোহপ্রাপ্তি স্বরূপবিস্মৃতি সুখ-দুঃখভোগ এবং স্বরূপপ্রতিষ্ঠালাভও এইজাতীয় একটা মায়ার কোলে ঘুমাইয়া পড়া ও মহামায়ার কৃপায় ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত। বলরামরূপী জীবাত্মার ভিতরে এইজাতীয় বন্ধন-মুক্তি পতন; উত্থান দুঃখ-সুখ আবরণ-উন্মোচনের লীলা আমরা সর্ব্বদাই তো প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আমাদের সকলের জীবনেই এইরূপ ঢাকাখোলা আসা-যাওয়ার উঠা-নামার অভিনয় সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যাহারা যতদিন অজ্ঞানবশে স্বরূপদর্শনে বঞ্চিত থাকে তাহারা ততদিন জ্ঞানাভাবে আনন্দাভাবে আপনাদিগকে বন্ধন-গ্রস্ত মনে করিয়া কষ্ট পায়, আর যাহারা জ্ঞানলাভ করিয়া স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছে তাহারা স্বেচ্ছায় মুক্তভাবে ভগবৎলীলারহস্যে যোগদান করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যায়। যাহাদের উপর মায়ার বন্ধন জোর করিয়া চাপান হয় তাহারা বদ্ধ, আর যাহারা স্বেচ্ছায় মায়ার আবরণ লইয়া খেলা করে তাহারা মুক্ত। মায়ার আবরণে বদ্ধ থাকিয়া জীব অল্পজ্ঞ অনীশ্বর, আর মায়াকে বশীভূত করিয়া ভগবান সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। সাধারণ জীব ঈশ্বর হইতে যত দূরে ততই মায়ার অধীন, ততই পুতুল হইয়া দুঃখ ভোগ করে মায়াকে দুরত্যয়া বলিয়া ভয় পায়; আর সাধক ভক্ত ভগবানের উপাসনা করিয়া সান্নিধ্য লাভ করিয়া ভগবৎকৃপায় মায়ামুক্ত হইয়া ঈশ্বরসাদৃশ্য

ঈশ্বরত্ব লাভ করে। সৃষ্টিব্যাপারটা জ্ঞানী সাধকের চোখে একটা লীলারহস্য আনন্দের বিকাশ হইলেও অজ্ঞানীর নিকট যেন একটা অভিশপ্ত অবস্থায় জেলখানায় কষ্টভোগ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একজনের ভাগ্যে যেমন কেবল সুখই সুখ, অন্যের ভাগ্যে ঠিক তেমনি যে কেবল দুঃখই দুঃখ! ক্রমবিকাশের যত নিম্নস্তরে থাকা যায় ততই যেন স্বরূপ-বিস্মৃতি এবং তাহার ফলস্বরূপ দুঃখপ্রাপ্তি, আর যত উপরে উঠা যায় ততই যেন স্বরূপউপলব্ধি এবং আনন্দউপভোগ। আত্মায় অনাত্মভাব এবং অনাত্মায় আত্মভাবের আরোপকেই অধ্যাস বলে; এই অধ্যাস আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক—রজ্জুত্ব ব্রহ্মত্ব আবৃত করিয়া সর্পকে জগৎজীবরূপে প্রতীয়মান করাই এই অধ্যাসের কাজ। অপবাদ দ্বারা আমরা এই অধ্যাস দূর করিয়া সর্পকে রজ্জুভাবে জগৎজীবকে ব্রহ্মভাবে অনুভব করিতে সক্ষম হই। অধ্যাসের প্রভাবে মায়ায় আবৃত (Involved) হইয়া জীব অসুরত্ব প্রাপ্ত হয়, অপবাদের প্রভাবে মায়া হইতে অজ্ঞানাবরণ হইতে মুক্ত (Evolved) হইয়া জীব আবার দেবত্ব লাভ করে। একের উৎপত্তি স্বর্গচ্যুতি নিয়ম-লঙ্ঘনে, অপরের উৎপত্তি স্বর্গপ্রাপ্তি নিয়মপালনে। সংসারটা তাই একটা দেবাসুরের সংগ্রামক্ষেত্র। ইহার ভিতর দিয়া আমরা নিয়মলঙ্ঘনের বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়া ভগবৎ-বিধানের তালে তালে চলিয়া ভগবৎউপাসনার ভিতর দিয়া

ভগবৎস্বরূপতা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকি। দেবতা ও অসুরের পিতা একই কশ্যপ একই পরব্রহ্ম একই দ্বন্দ্বাতীত (neutral) অবস্থায় স্থিত অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্ব। মা কিন্তু পৃথক পৃথক—একের মা অদিতি মায়া সমষ্টিভূত অখণ্ডনীয় ব্রহ্মশক্তি, অপরের মা দিতি অবিদ্যা ব্যষ্টিভূত খণ্ডনীয় ব্রহ্মশক্তি। দিতি অবিদ্যা ভেদাত্মক অহংভাবের অসুরভাবের উৎপত্তি ও বিনাশের আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্য দিয়া আত্মার স্বরূপবিকাশের ভগবানে আত্মনিবেদনের সহায় হইয়া ভগবৎলীলাকে আস্বাদ্য অনুভববেদ্য করিয়া তোলে। দ্বন্দ্বাতীত (neutral) তত্ত্ব হইতে দ্বন্দ্বাত্মক ভাল-মন্দ (positive negative) দেবাসুরভাব না হইলে যে ভগবানের সৃষ্টিলীলা সকল হয় না। এই কাজে উভয়ের অস্তিত্ব উভয়ের কার্য্যকলাপ সমানভাবে প্রয়োজনীয়। অসুরসৃষ্টি জগৎসৃষ্টি ভগবানের আবৃত অবস্থা এবং দেবতাসৃষ্টি জগতের লয়ব্যাপার ভগবানের আবরণ-মুক্তি, এই উভয় ভাবই যে তাঁহার লীলার সহায়। উভয় ভাব লইয়াই তো তিনি লীলারত লীলাময় সগুণ ব্রহ্ম। 'অধ্যাস' ঢাকিয়া রাখা আবরণ করা দিতির কাজ, 'অপবাদ' ঢাকনা খোলা মুক্ত করা অদিতির কাজ; সেই অনাদি কালের প্রকৃতি-বালিকা দিতি-অদিতিরূপে সৃষ্টি ও লয়াত্মিকা খেলা লইয়া ব্যস্ত! জীব যখন এই খেলার রহস্য অবগত হইয়া খেলাঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মা বলিয়া উধাও হইয়া মহামায়া মূল প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হয়, প্রকৃতি তখন অন্ততঃ

তাহার সম্বন্ধে এই ধূলাখেলা ত্যাগ করিয়া প্রিয়তম শিশুটিকে জ্ঞানানন্দরূপ দুগ্ধ পান করাইয়া ব্রহ্মানন্দে বিভোর করিয়া দেন। তাহার সম্বন্ধে যেন সৃষ্ট্যাদি লীলা তখন লয় পায় কিংবা অপ্রাকৃত ভাব অপ্রাকৃতরূপ ধারণ করিয়া ভগবৎলীলার সহায় হয়।

বিষয়

* * বিষয় যতই সুন্দর হউক না কেন, সে নিজে আমার প্রকৃত আনন্দের কারণ হইতে পারে না। বিষয়ের মধ্যে তাঁহার গায়ের গন্ধ আছে তাই তো বিষয় আমার এত প্রিয়। তাঁহারই সৎবিভূতি সুন্দর সুন্দর জিনিসের মধ্য দিয়া সাধক ভক্তের প্রাণে আনন্দ বিতরণ করে। তাঁহারই চিৎবিভূতি জীবের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়া আমাদিগকে জ্ঞানী-পণ্ডিতদের দিকে টানিয়া লয়। তাঁহারই আনন্দবিভূতি সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবের মধ্য দিয়া আমাদিগকে আনন্দময়ের মধুর আহ্বান জানাইয়া দেয়। তাঁরই আনন্দের কণা লইয়া সংসার সকলকে আনন্দ দিয়া থাকে। যাহার মধ্যে তাঁহাকে পরমাত্মাকে যতটা বেশী করিয়া পাই, সে আমাদের তত বেশী আত্মীয় ও প্রিয় হয়। প্রিয় জন প্রিয়

ফল, ফুল আদি আমার বহির্মুখ মনকে আমার আত্মার নিকটে আনিয়া দেয়। মন তাহাদের নিকটে থাকিতে ভালবাসে থাকিতে চেষ্টা করে, সুতরাং তাহাদের আগমনে মনও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।...তখন আনন্দময় আত্মার সান্নিধ্যে মনও আনন্দে ভরপূর হইতে আরম্ভ করে। আনন্দের কারণ ভিতরকার আত্মা আত্মার সান্নিধ্য, চঞ্চল মন তাহা বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় মনে করে বিষয়ই বুঝি আনন্দ দিতেছে।...বিষয় যতই সুন্দর ও মধুর হউক না কেন, তাহার মূল্য যতটুকু তাহা হইতে সে যেন বেশী দাবী করিয়া না বসে। রাজবাড়ীর রাস্তার সৌন্দর্য্য রাজার মহিমা প্রচার করে প্রাণে আনন্দ দেয়; কিন্তু সেই পথের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া সেখানে বসিয়া থাকিলে রাজার বাড়ীতে যাওয়া রাজার দর্শন পাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আমরা যতই আনন্দময়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি, ততই সর্ব্বত্র তাঁহার আনন্দবিভূতি দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া পড়ি। এই আনন্দের মোহে আমাদের পাইয়া বসিলে আর যে সম্মুখে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনাও থাকে না। তখন যে তাঁহার বিভূতিবিশেষকে 'তিনি' মনে করিয়া প্রতারিত হইবার পরমানন্দলাভে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা আসে। রাজার কর্ম্মচারীদের রাজা মনে করিলে প্রকৃত রাজমহিমা আস্বাদ করিতে অক্ষম হইব; এবং রাজাকে ভুল ভাবে প্রচার করিতে গিয়া লোকের অনিষ্ট সাধন করিয়া

বসিব। বিষয় সাহায্য করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, তবে সে যেন আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিবার সুযোগ না পায়; সে যেন আমাদের সেই পরম বিষয়ীর দিকে ছুটিয়া যাইতে বাধা না দেয়। বিষয়কে বেশী অধিকার দিতে গেলেই সে যে আমাদিগকে পাইয়া বসিবে—আমাদের মনটাকে তখন একটা বাহিরের বিষয়ের নেশায় মোহিত করিয়া রাখিয়া আমার 'আসল আমি' হইতে ভিতরকার পরমাত্মা হইতে আরও দূরে টানিয়া লইয়া যাইবে। মনটা তখন বহির্মুখ হইয়া কেবল বাহিরে ছুটাছুটা করিয়া বেড়াইতে চাহিবে।···মনটাকে জানাইয়া দিতে হইবে যে আনন্দের প্রস্রবণ ভিতরে—বাহিরে নয়।······মনকে অন্তর্মুখী করিতে যতটা বিষয়ের দরকার ততটাই সুন্দর; ফুল দেখা সুন্দর সুন্দর গান শোনা ভাল, বেশী করিতে গেলেই কিন্তু উহা আমাদিগকে পাইয়া বসিবে। মনে রাখিতে হইবে আমাদের ছুটিয়া যাইতে হইবে সেই মূল প্রস্রবণের কাছে—রাস্তায় থাকিলে চলিবে না। তাঁর বিলাসবিভূতি আমাদের অতি আদরের সামগ্রী; কিন্তু তিনি নিজে যতটা আদরের ধন তাঁর বিকাশ কখনও ততটা প্রিয় হইতে পারে না। আসলে ও নকলে বিম্বে ও প্রতিবিম্বে মানুষে ও তার ছবিতে যে অনেকটা তফাৎ। আমরা যেন নকলে ভুলিয়া আসলকে হারাইতে না বসি। 'কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে' গানটী স্মরণ কর। প্রেমিক শশাঙ্কজ্যোতি ভালবাসেন, কিন্তু তার মধ্য দিয়া যদি

তাঁহার প্রিয়তমের লাবণ্য ফুটিয়া বাহির না হয় তবে সে চাঁদ তিনি দেখিতে চান না। সুকুমার কুমার-মুখ দেখিয়া যদি সে প্রেম বয়ান মনে না পড়ে, সতীর পবিত্র প্রেমে যদি ভগবৎ-প্রেম জড়িত না থাকে, তবে সে সব সুন্দর দৃশ্য সাধক-ভক্তের প্রাণে আনন্দ দিতে পারে না।

দার্জিলিং—৬।৪।২৫

স্বভাব

⁂ অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার শ্রীভগবান আমাদিগকে তাঁহার সেই আনন্দধামে টানিয়া লইবার জন্য তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে তাঁহার গায়ের সুগন্ধ মাখাইয়া দিয়াছেন, সমস্ত রাস্তায় তাঁহার মালার সুগন্ধ ছড়াইয়া দিয়াছেন। আমরা যেখানে যা কিছু সুখশান্তি আমোদআহ্লাদ উপভোগ করি, তাহা শুধু তাঁহারই পরোক্ষানুভূতি। তাঁহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বৃক্ষ-লতা আকাশ ফল-ফুলাদিকে এমন সুন্দর করিয়া দিয়াছে, তাঁহারই মধুর সম্বোধন মা-বাপ স্ত্রী-পুত্র কন্যাগণের ভিতর দিয়া আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে! তাঁহার জ্যোতি তাঁহার সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রেম অখণ্ডভাবে সহ্য করিতে পারিব না বলিয়াই ত তিনি একটু দূরে থাকিয়া অনন্ত রূপের অনন্ত ভাবের ভিতর দিয়া আমাদের জীবনের অনুকূলভাবে আসিয়া

হাজির হইতেছেন। আমরা এত অন্ধ এত মূর্খ যে ইহাদের মধ্য হইতে তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া হীরা ফেলিয়া কাচে আসক্ত হইতেছি। "সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করি শুধু হলাহল"। এইজন্যই তো এ সব আত্মীয়স্বজনদেরে মাঝে মাঝে দূরে সরাইয়া লইয়া বিষয়ের স্বরূপ দেখাইয়া তাঁহার কথা মনে করাইয়া দিতে হয়। শুধু বিষয়ই যে সুখের কারণ নহে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ভোগের সব সামগ্রী সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও প্রিয়তম স্বামী বা পুত্রের অভাবে ইহারাই দুঃখের আকারে পরিণত হয়। ইহারা পূর্ব্বে যে পরিমাণ সুখ দিয়াছিল এখন ঠিক সেই পরিমাণে দুঃখ দিতেছে। শুধু বিষয়ই সুখের কারণ হইলে বিষয় তো আজ উপস্থিত, তবে সুখ না হইয়া দুঃখ হইতেছে কেন? তারপরে মনে কোনরূপ অশান্তি আসিয়া জুটিলে তখন অতি আদরের সামগ্রীগুলাও বিষবৎ মনে হয়। পাঠে কিংবা গানে মন তন্ময়, এ অবস্থায় পুত্রাদির মধুর আহ্বানও বিরক্তির কারণ হয়। ভোগের সামগ্রী আত্মীয়স্বজন সব সম্মুখে উপস্থিত, এমন সময় কোনও সাধু আসিয়া বলিল 'কাল তোমার মৃত্যু হইবে'; তখন কি আর এ সব মনে শান্তি দিতে পারে? অপর দিকে যাঁহাদের ইন্দ্রিয় সংযত চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত তাঁহারা অতি সামান্য বিষয় হইতে প্রচুর শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। গরীবেরা মোটা কাপড় পরিয়া শুধু ডালভাত খাইয়া যেরূপ আনন্দে থাকে, রাজা মহারাজারা অতুল ভোগঐশ্বর্য্যের

মধ্যে থাকিয়াও সে আনন্দ কখনো উপভোগ করিতে পারেন না। পুত্র বিদেশে থাকিয়া সুখে আছে, অথচ লোকমুখে তাহার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া মা-বাপ কাঁদিয়া অস্থির! আবার যখন সেই ছেলে বাস্তবিক মরিয়া গিয়াছে, তখন তাহার মা-বাপ সংবাদ না পাওয়ায় ছেলে সম্বন্ধে আকাশকুসুম কল্পনা করিয়া আনন্দে বিভোর! ইহা হইতে বুঝা যায় সুখদুঃখ মনের ধর্ম্ম মনের ভাবের উপরই ইহা অনেকাংশে নির্ভর করে; সুতরাং জগতের সৌন্দর্য্যরাশি ভোগ করিতে হইলে মনের শিক্ষার একান্ত আবশ্যক।

* * দুঃখ সম্বন্ধে কি আর লিখিব? ন্যায় বলেন প্রতিকূল-বেদনা দুঃখ—অর্থাৎ আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণগত বৃত্তিগুলির অনুকূল স্রোতগুলি আমাদের সুখের কারণ হয় এবং প্রতিকূল-স্রোতগুলি দুঃখ উৎপাদন করে। পৃথিবীতে দুই প্রকার কর্ম্ম-স্রোত দেখিতে পাওয়া যায়, একটা সচ্চিদানন্দপ্রাপ্তির অনুকূল অপরটা উহার প্রতিকূল। ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল স্রোতগুলি প্রকৃত সুখের কারণ। পূর্ণ সচ্চিদানন্দ আমাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে চেষ্টা করিতেছেন—একাজে তাঁহাকে কত বাধা অতিক্রম করিতে হইতেছে। আমাদের সংস্কার আমাদের শিক্ষা যদি সচ্চিদানন্দ-প্রাপ্তির অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহার

প্রকাশের বাধা দূর করাকে আমরা কখনই দুঃখ বলিয়া অনুমান করিতে পারি না। তখন দেখিব সমস্ত ঘটনা সমস্ত কার্য্য সমস্ত পরিবর্ত্তন আমাদের সাহায্য করিতেছে আমাদের কল্যাণ করিতেছে, আমাদিগকে আমাদের প্রাণারামের নিকট লইয়া যাইতেছে। আর যদি আমাদের সংস্কার আমাদের শিক্ষা প্রকৃত উন্নতির প্রতিকূল হয় অর্থাৎ আমরা যদি কতকগুলি কুসংস্কার লইয়া জন্মিয়া থাকি এবং পৃথিবীতে আসিয়া সুশিক্ষার পরিবর্ত্তে কুশিক্ষাই পাইয়া থাকি, তবে আমাদের প্রকৃতি আমাদিগকে খারাপ দিকে চালাইতে চেষ্টা করিবে। সে অবস্থায় সচ্চিদানন্দ-প্রাপ্তির প্রত্যেক কার্য্যই সচ্চিদানন্দ-প্রকাশের তরঙ্গ মাত্রই আমাদের প্রকৃতিতে বাধা বলিয়া মনে হইবে। তখন প্রত্যেক কল্যাণকর কার্য্যগুলিই আমাদের নিকট দুঃখ বলিয়া মনে হইবে। তাই তো বলা হয় যে কল্যাণকামী পুরুষ সর্ব্বত্রই সুখ ও মঙ্গল-চিহ্ন দেখিতে পান এবং কুপথগামী পুরুষ সর্ব্বত্রই দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং যে যত খারাপ সে তত দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। কে কতটা দুঃখে বাধায় অভিভূত হয়, তাহা দেখিয়া মানুষের উন্নতি-অবনতি কতকটা ঠিক করা যাইতে পারে। তবে মানুষ যত ভগবানের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই ভগবৎপ্রাপ্তির বাধাগুলি তাহার নিকট বিশেষ অসহ্য হইয়া উঠে। অনেকে বলেন সংসারে যার যত আসক্তি যার যত মায়া তার তত দুঃখ, কথাটা অনেকাংশে ঠিক। কারণ আসক্তি

বা মায়া ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল সুতরাং দুঃখের কারণ। তবে প্রেমিকের মনে অন্যের দুঃখ দেখিয়া যে দুঃখের উদয় হয় এবং সে দুঃখ দূর করিবার তাঁহারা যে চেষ্টা করেন, তাহা দয়াময়ের দয়াগুণ বিকাশের সাহায্য করে বলিয়া দুঃখের কারণ না হইয়া আত্মপ্রসাদরূপে আনন্দেরই কারণ হইয়া থাকে। ভগবান পরমাত্মা আপনা হইতেও অধিক আপনার, তাই নিজের কল্যাণের জন্য নিজের আনন্দের আশায় বা যাহাদের সঙ্গে আমিত্বের সম্বন্ধ আছে তাহাদের সুখের জন্য যাহা কিছু করা যায় তাহা প্রায়ই সুখের কারণ হইয়া থাকে। প্রিয়তমের জন্য দেহত্যাগ পর্য্যন্ত পরমানন্দ-জনক বলিয়া বর্ণিত হয়। প্রিয়জনের সহিত মিলনের জন্য ভগবৎদর্শনের জন্য যত কিছু কঠোরতা যত কিছু কষ্টকর কাজ ভক্তগণ প্রেমিকগণ তাহা সাদরে বরণ করিয়া থাকেন।...

চাওয়া ও তৃপ্তি

**সাধকের কল্যাণের দিকে ভগবানের বিশেষ দৃষ্টি। তাই সমস্ত অসুবিধা দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া সাধকের সমস্ত কর্ম্মফল শেষ করিয়া চিত্তের সমস্ত ময়লা দূর করিয়া তাহাকে ভগবৎ-ধামের উপযুক্ত করিতে তিনি মহা ব্যাকুল। শীঘ্র কাছে না আনিলে চলে না, তাই অন্যে যাহা দশ জীবনে ভোগ করিবে সাধুর তাহা দশ মাসে ভোগ করিয়া লইতে হয়। দুঃখের মর্ম্ম তাঁহারা জানেন তাই সুখ চান না। অসৎ লইয়া তৃপ্ত থাকিলে সময়ে বঞ্চিত হইতে হইবে, তাই ভগবান ছাড়া সাধক আর যাহা চাহিবেন তাহাতেই তাহা হইতেই পদে পদে বাধা পাইতে হইবে, ব্যাধির বাধার যাতনা ভোগ করিতে হইবে। প্রকৃত সাধক ইহার মধ্যেও ভগবৎকৃপা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

অন্যের ভুলত্রুটী সহ্য করা যায়, কিন্তু সন্তানের ওসব আত্মার মলিনতা মা কখনও সহ্য করেন না। ছেলেকে আদর্শ ছেলে তৈয়ার করা চাই, কেহ নিন্দা করিবে তাহা সহ্য হয় না। এ শাসন প্রেমের নিদান। আনন্দ ও শান্তির প্রস্রবণ

রহিয়াছে নিজের ভিতরে। মানুষ সেদিকে না চাহিয়া আনন্দের আশায় বাহিরে ছুটিয়া যায় বাহিরে ছুটাছুটি করে। 'নিজ নাভিগন্ধে মত্ত মৃগ ইতস্ততঃ ছুটে গন্ধ অন্বেষণে'।' যাহা রহিয়াছে ভিতরে তাহা বাহিরে কোথায় পাইবে? বাহিরে যেটুকু আনন্দ দেখিতে পাও তাহাও যে ভিতরের ছায়ামাত্র। আনন্দ আত্মার ধর্ম্ম, মন যত আত্মার নিকটে থাকিবে নিকটে যাইবে তত সে আনন্দ ভোগ করিবে। মনটা বিষয়কে আনন্দের কারণ মনে করিয়া বিষয়ের কাছে প্রিয়জনের কাছে ছুটিয়া যায়; তখন আত্মা হইতে দূরে যাবার জন্য দুঃখ ভোগ করে। প্রিয়-জনের আগমনে মনটাও আশ্রয়ের সঙ্গে আত্মার নিকটবর্ত্তী হওয়ায় সুখভোগ করে। এখানে সুখ দেয় আত্মার সান্নিধ্য, কিন্তু মন ভাবে সুখ দিতেছে বিষয়; তাই বিষয়ে আরও আসক্ত হইয়া পড়ে। মনের আত্মসান্নিধ্যই আনন্দের কারণ। যাহার সুখ-দুঃখ শান্তি-অশান্তি তৃপ্তি-অতৃপ্তি কোন চঞ্চল জিনিসের উপরে, লোকের কথায় বা সমাজের মতামতের উপরে নির্ভর করে তাহার শান্তিলাভ দুর্ঘট। 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ' হওয়া চাই।……লক্ষ্য পদার্থ ঈপ্‌সিততম এমন সুলভ হওয়া চাই চেষ্টা করিলেই যাহা পাওয়া যায়, যাহা পাইতে কোনও বাধা নাই, যাহা হারাইবার কোনও ভয় নাই—সংসারসমাজ লোকজন আচার-ব্যবহার যাহার প্রাপ্তিতে বাধা দিতে পারিবে না। এজন্য সাধুরা ভগবান ছাড়া আর কিছু চান না—যাহা

কেহ চাহিবে না, যাহা লইয়া কেহ ঝগড়া করিবে না তাহাই তাঁহাদের অবলম্বন। মহাদেবের বিভূতি হাড় সর্প ও ছাই। এজন্য সন্ন্যাসীদের ত্রিবিধ এষণা ত্যাগ করিতে হয়। গাছতলায় বাস—আশ্রম করিলেই ত নানা উপাধি আসিয়া জুটিবে। শেষে 'কৌপীনকো আস্তে' অতুল ঐশ্বর্য্য আসিয়া দেখা দিবে। যাহা ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় নহে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য একান্ত আবশ্যক নহে, তাহার বোঝা বহনে সন্ন্যাসী অসম্মত। 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্'—ইহা সাধিকা মৈত্রেয়ীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী।

হরিদ্বার—১৯০১

* * মা, আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে এ পৃথিবীটা আমাদের স্বদেশ নয়। আমাদের প্রকৃত বাসস্থান সেই দেশে সেই আনন্দধামে 'যে দেশের অভিধানে দুখ মানে সুখ রে, তুমি মানে আমি বই আর কিছু নয় রে', যে দেশে হিংসা-দ্বেষ দুঃখ-কষ্ট রোগ-শোক প্রবেশ করিতে পারে না। একটা অসার কাল্পনিক সুখের আশায় ভুলিয়া আমরা এখানে আসিয়াছি। 'বলরামের মায়া দেখা'র গল্পটা মনে রাখিবে। আমরা এদেশে আসিয়া সেই বলরামের মত সে দেশের সে সুখের কথা, সে

দেশের সে আনন্দের কথা, সে দেশের সেই শান্তিময় জ্ঞানময় প্রেমময়ের কথা যেন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু সে দেশের সেই সুখের একটী অস্পষ্টস্মৃতি জাগরূক থাকে বলিয়া এখানে আসিয়াও আমরা সেই সুখের স্মৃতিটা একেবারে ছাড়িতে পারি না। কোথায় সুখ কি করিয়া সুখ হইবে ভাবিয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই। প্রাণের পিপাসায় অধীর হইয়া সুখের অবলম্বন ভাবিয়া আজ এটা কাল ওটা করিতে গিয়া প্রতারিত হই, জানি না যে শান্তিময়ের শান্তিধাম ছাড়া অন্যত্র সুখের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সংসারে যতটুকু সুখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও যে সেই সুখের একটা কণা বা ছায়া মাত্র তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সংসারে যে সেই সুখময়কে ছাড়িয়া সুখ আছে, একথা স্বীকার করা দূরে থাক্ একথা আমি মুখেও উচ্চারণ করিতে পারি না। যাঁর আনন্দের ছায়া লইয়া আমরা আনন্দ করি সেই আনন্দময়ের দিকে আমরা তাকাই না, সেই আনন্দময়কে পাইবার জন্য আমরা ব্যস্ত হই না। সংসারের অসার সুখের জন্য আমরা যত পরিশ্রম করি সেই আনন্দময়কে পাইবার জন্য যদি তাহার হাজার ভাগের এক ভাগও পরিশ্রম করিতাম তাহা হইলে আমাদের সকল জ্বালা-যন্ত্রণার নিবারণ হইত, দুঃখ-কষ্টের অবসান হইত, প্রাণের পিপাসা মনের বাসনা হৃদয়ের বেদনা এতদিনে একেবারে দূর হইয়া আমরা যে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতাম। তাই সংসারে

যাহারা ধন জন ঐশ্বর্য্য লইয়া ভুলিয়া থাকে তাহাদের বড়ই দুর্ভাগ্য মনে হয়। ইহা অপেক্ষা গরীব হইয়া শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকাও যেন শতগুণে ভাল। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়িয়া মানুষের মন একটু ভগবানের দিকে যাইতে পারে এবং সংসারের অনুচিত আসক্তিও একটু কমিতে পারে। এত দুঃখ-কষ্ট দেখিয়াও মানুষ যখন এ দেশের আসক্তি ছাড়িতে পারে না, তখন এদেশে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিলে যে সে দেশের দিকে মানুষের নজর পড়িত, একথা আমিতো বিশ্বাস করিতে পারি না। এদেশে যদি সুখ থাকিত তবে জানি না মানুষের কি দুরবস্থা হইত। সংসারের আসক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া কতবারেই যে মানুষকে সংসারে যাতায়াত করিতে হইত তাহার ঠিক ছিল না। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া যদিও আমার কষ্ট হয় এবং তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করি তবু দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সংসারের অসারতা বোধহয় এবং ভগবানের দিকে প্রাণের পিপাসাটা দিন দিন বৃদ্ধি পায় তাহারও চেষ্টা করি। তোমরা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে, যে দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়াই তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অর্থাৎ আমার সঙ্গে একটু বেশী মেশামিশি আরম্ভ হইয়াছে, আর দুঃখকষ্টের ভিতর পড়িয়াই তোমাদের মন আস্তে আস্তে ভগবানের দিকে ফিরিতেছে। এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে না পড়িলে সংসারের

আসক্তি এরূপ কমিত কিনা এবং এরূপ কাতর প্রাণে ভগবানকে ডাকিতে কিনা সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ। আশা করি তোমরা আমার এই কথাগুলি মনে করিয়া দুঃখ-কষ্টকে ভগবৎদত্ত কর্ম্মফলরূপ প্রসাদ মনে করিয়া তাহাতে বিচলিত হইবে না। একটা গানে আছে—"বিপদ সম্পদের তাঁরে দিতে পরমপদ তারে বিপদ নইলে জন্মান্ধ জীব ডাকেনা তোরে, মা তোর করুণার ফল বিপদ কেবল জাগায় অবোধ বালকে"। তোমরাই বলনা কেন, বিপদ মানুষের ভালর জন্য কি মন্দর জন্য আসিয়া থাকে? তারপরে সংসারের সুবিধা-অসুবিধা সুখ-দুঃখ যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফল, তখন তাহার যতটা ভোগ হইয়া যায় যতটা দেনা শোধ হইয়া যায় ততই যেন ভাল মনে হয়, মনটা অনেকটা হালকা হয়। তবে সংসারের দুঃখ-কষ্টের ভিতর থাকিয়াও সংসার সুখ দিতে পারে, সংসারে কতলোক কতরকমে সুখে থাকে ইত্যাদি রকমের বিশ্বাস জনিত সংসার আসক্তি যদি মনে আইসে তবে কিন্তু তোমাদের সে অবস্থা বিশেষ খারাপ বলিতে হইবে। কারণ এই আসক্তির ফলে তোমাদের আবার সংসারে আসিয়া অসার বিষয়ে মজিয়া অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। এই বিষয়ে সাধু অসাধু ভাল মন্দ সবই সমান। তবে যাহাদের চিত্ত ভগবানের দিকে ধাবিত হয়, সেই স্বদেশ পানে যাহাদের দৃষ্টি পড়ে, তাহারা এখানকার অসার চাকচিক্যে আর ভুলিয়া

থাকিতে চায় না। তাহাদের এদেশের আসক্তি কমিয়া যায়। আর ভগবৎপ্রেম উপলব্ধি করিয়া তাহারা এমন একটা আনন্দ পায় যে, সে আনন্দের ঢেউএ সংসারের সব দুঃখ-কষ্ট যেন কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহাদের আর ইহারা যেন স্পর্শ করিতেও পারে না, কোনও অবস্থাই তাহাদেরে আর বিচলিত করিতে পারে না। তাই সে দেশের কথা সে দেশের রাজার কথা ছাড়া অন্যকথা আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না। যাহাতে সে দেশের দিকে মন যায়, যাহাতে একটা ভগবৎ-পিপাসা মনে জাগরূক হয়, তাহার চেষ্টা প্রথমেই আমার করিতে ইচ্ছা হয়। একবার পিপাসা প্রবল হইলে জল যেখানেই কেন থাকুক না খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। জল না হইলে তখন আর যে চলিবে না। তখন আর পূজা করিবার জন্য এতটা অনুরোধ করিতে হইবে না, পূজাদি নিয়মমত না করিয়া থাকিতে পারিবে না। আমার প্রথম কার্য্য এই পিপাসাটা তৈয়ার করিয়া দেওয়া।

আমাদের বেশ সুন্দর করিয়া দেখিতে হইবে বুঝিতে হইবে মনে রাখিতে হইবে বুঝাইতে হইবে যে, বাস্তবিক যাহা তাহাকে ঠিক ভাবে না বুঝিয়া অন্যভাবে বুঝাই যে মায়া—"বস্তুন্যবস্থারোপঃ অধ্যারোপঃ" এক বস্তুতে অন্য বস্তুর অধ্যারোপ

বহির্মুখ দৃষ্টি

আরোপই যে মায়া, যাহা সমস্ত অনর্থের দুঃখকষ্টের আপদ-বিপদের মূল! এই মায়াই নিত্যসিদ্ধ মুক্তস্বভাব জীবকে অধ্যারোপের দ্বারা সংস্কারের দ্বারা আসক্তির দ্বারা সংসারের সহিত বাসনা ভুল-ভ্রান্তির সহিত বাঁধিয়া ফেলিয়া, বাঁধিয়া ফেলার একটা ভাণ করিয়া, অনিত্য অসিদ্ধ বদ্ধরূপে প্রতীয়মান করিয়া তোলে। রজ্জুকে সর্প মনে করা যেমন ভুল, অশান্তি-অতৃপ্তির দুঃখকষ্টের কারণ, সর্পকে রজ্জু মনে করাও ততোধিক ভুল, অশান্তি-অতৃপ্তির দুঃখ-কষ্টের কারণ। এই যে আমরা ভিতরের দিকের সব কথা ভুলিয়া গিয়া একেবারে বাহিরের দিকে অবাধিত বেগে ছুটিয়াছি, ইহা কি কম মায়ার কথা—কম সর্ব্বনাশের কথা? মনে পড়ে সেই সেদিনের কথা, যখন আমাদের মধ্যে ধনী

গৃহস্থেরও ব্যক্তিগত প্রয়োজন বেশী কিছু ছিল না। প্রধানা কর্ত্রীর বেশভূষা ও ব্যবহার দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত আশ্রিত আর সকলের কোন পার্থক্য আছে। সাদাসিধা খাওয়া-পরায় সকলেই পরিতৃপ্ত হইত। গোলায় ধান, উঠানে ডাঁটাশাক থাকিলে আর কোন অভাব বোধ হইত না। হরির লুঠের দুখানা বাতাসায় কি আনন্দের ধ্বনি উঠিত! কি আনন্দের সে গান! এখনও মনে পড়ে বেশী দিনের কথা নহে অতিথিকে যত্নপূর্ব্বক খাওয়ান ছিল আমাদের ব্রত। তাহাতে উপকরণের বাহুল্য ছিল না। আমরা নিত্য যাহা খাই তাহা হইতেই নিজকে কিছু বঞ্চিত করিয়া অন্যের সেবা করাই ধর্ম্ম ছিল। তাহাতে বেশী কিছু লাগিত না—লাগিত মনের শ্রদ্ধা। তাহাতে যে গৃহকর্ত্তা ও অভ্যাগত উভয়েই তৃপ্ত হইতেন। সে সব সুখের দিন কোথায় গেল? এখনকার উপকরণবহুল ভোগসুখে, দেখান আদরে সে আনন্দ আর পাই কি? উপকরণ অল্প হইলেই মন খারাপ হইয়া যায়—হৃদয়ের প্রাচুর্য্য এখন আর আয়োজনের অপূর্ণতাকে ভিতর হইতে পূর্ণ করে না। এখন মার পেটের এক ভাই ধনী আর এক ভাই গরীব—ছেলেমেয়েদেরে দেখিলেই বুঝা যায়—লোকেও বলে। বলত ইহার কারণ কি? নিজেদের মন সঙ্কীর্ণ করিয়াছি, নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থকে আরও ক্ষুদ্র করিয়াছি, বাহিরে তো তাহার প্রকাশই দেখা যাইবে। এই যে বাড়ী গেলে খাবার কষ্ট

শোবার কষ্ট হইবে বলিয়া বোর্ডিং হইতে ছেলে ছুটীতে বাড়ী যাইতে চায় না, ভাল খাদ্য নাই সুখের উপকরণ নাই বলিয়া সেখানে ভাল লাগে না; মাংস নাই পায়স নাই বলিয়া ছেলে-মেয়েরা কাকীমার কাছে যেতে চায় না, কাকীমার কথা মনে পড়ে না, ইহার কারণ কি বলতো? মাংস ও মিষ্টান্নের দামটা যে এখন মা কাকীমার প্রাণটার ভালবাসার আদর-সোহাগের দামের চেয়ে বেশী মূল্যবান হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ছোট বেলা কত আগ্রহের সহিত মাসীমার মলিন কাঁথায় ছেঁড়া পাটিতে তাঁহার কাছে শুইয়া কি যে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতাম, তাহা কি আজকালকার সভ্য ছেলেমেয়েরা বুঝিতে পারিবে? পিসীমার মুড়িমুড়কি দুটো নাড়ু চীনে বাদাম আমাদিগকে যে তৃপ্তি যে শান্তি প্রদান করিত রসগোল্লা সন্দেশাদি মিঠাই খাইয়া তোমরা তোমাদের ছেলে-মেয়েরা আজ যে সে তৃপ্তি কল্পনায়ও আনিতে পার না! বিদুরের স্ত্রীর খুদের মধ্যে কলার খোসার মধ্যে যে কি অমৃত নিহিত ছিল, তাহা প্রেমময় কৃষ্ণচন্দ্র ছাড়া অন্যে আর কি করিয়া বুঝিবে? এই অমৃত আস্বাদনের জন্য তিনি দুর্য্যোধনের রাজভোগকে অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে তুচ্ছ করিয়াছিলেন। জিনিসটার মূল্য অপেক্ষা প্রাণটা মনটার আত্মাটার মূল্য যে কতগুণ বেশী, তাহা জড়বাদী বাহ্যসর্ব্বস্ব সুসভ্য জাতির বিশেষতঃ তাহাদের শিষ্যবৃন্দের পক্ষে বুঝিয়া উঠা একটা কঠিন ব্যাপার। এই যে

গরীবের ছেলে-মেয়ে সৌখীন হাওয়ায় পড়িলে মায়ের রান্না ভাত আর ভাল লাগে না, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ভাল লাগে না—সামান্য কাপড়ের বেশভূষা সুগন্ধ আতরের প্রলোভনে মা-মাসীমার কথা ভুলিয়া যায় তাঁহাদের কাছে যাইতে আর ইচ্ছা হয় না; এই যে বন্ধুদের বাহ্যিক ভালবাসার মোহে মার অকৃত্রিম নিস্বার্থ ভালবাসাকে ভুলাইয়া দেয়, যেখানে বাহ্যিক সৌন্দর্য্য যেখানে তামসিক আদর-সোহাগ, যেখানে মৌখিক ভালবাসার কথা যেখানে প্রলোভনের উৎকট তাণ্ডব-লীলা, সেখানেই কেবল ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, ইহার পরিণাম কোথায় তাহা কি. ইহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা একবারও একটু তলাইয়া ভাবিয়া দেখেন ? যেখানে প্রাণটার চেয়ে বিলাসিতার দাম বেশী, সেখানে সুখের উপকরণগুলি পাওয়া গেলেও যে প্রাণটা পাওয়া যায় না এবং তাহার ফলে আপদ-বিপদের সময় এসব বন্ধুদের নিকট হইতে সাহায্য-সেবা আদর-যত্নলাভে বঞ্চিত হইয়া আমাদিগকে কি ভাবে প্রতারিত হইতে হইবে, সময় থাকিতে তাহা. একটু ভাবিয়া দেখিবার . সুযোগ পাওয়াকে সৌভাগ্যের কথা বলিয়া মনে হয়। প্রলোভন ইহাদিগকে কোন্ অবস্থায় কতদূর অবধি লইয়া যাইবে তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া আমরা কিন্তু তত সহজ কাজ মনে করি না। বিলাসিতায় মা-বাপের আদর-সোহাগে লালিত-পালিত মেয়েরা যে কিছুদিন পরে কিভাবে শশুরবাড়ী গিয়া ঘরের কাজ-

কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে, কি করিয়া স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবায় মন দিয়া তৃপ্তিলাভ করিবে, তাহা মস্ত একটা ভাবিবার বিষয়। আমরা অনেক সময় মেয়েদের বিলাসিতাকে অস্বাভাবিক ভাবে প্রশ্রয় দিতে গিয়া কিভাবে যে আমাদের জামাই-বেয়াইদের জীবন ভারাক্রান্ত হতাশ ও দুঃখময় করিয়া তুলি, তাহা আমরা একবারও বোধ হয় ভাবিয়া দেখিবার সুবিধা পাই না। এই সব শিক্ষিত বিলাস-প্রিয় মেয়েদের পোষ মানাইয়া নিজের অবস্থার অনুকূল ভাবে চালাইয়া সবদিকে একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা যে কি ভয়ানক কঠিন কাজ, কি কঠোর সাধন-সাপেক্ষ তাহা ইহাদের হতভাগ্য স্বামিগণ ছাড়া অন্যের পক্ষে বুঝিয়া উঠা তত সহজ কথা নহে। বাহ্যিক রূপের বেশ-ভূষায়, অর্থের স্বার্থের মোহে অভিভূত হইয়া এইজাতীয় ধনীর মেয়ে বিবাহ করিয়া জীবনটাকে এইভাবে ভারাক্রান্ত অশান্ত দুঃখময় করিয়া তোলাও একটা কম মায়ার অধ্যাসের অজ্ঞানতার কাজ নহে। বড়ই পরিতাপের কথা, বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করার পরে অনেকের আর মা-বাপ ভাল লাগে না—তাঁহাদের আদর-যত্নের ভালবাসার কথাবার্ত্তার ভিতরে নাকি তাহারা আর কোন আন্তরিকতার ভাব দেখিতে পায় না। মনে রাখিতে হইবে, যে ভালবাসা কর্ত্তব্যসাধনে বাধা দেয়, কর্ত্তব্যগুলির একটা অপূর্ব্ব সমন্বয়ের মধ্য দিয়া জীবনটাকে সুন্দরভাবে পরিণত করিয়া তুলিবার আদর্শস্থানীয় করিয়া

তুলিবার সুযোগ না দেয় সে ভালবাসা প্রেম নয়, তাহা কাম— তাহা আমাদিগকে স্বর্গের প্রলোভন দেখাইয়া নরকের পথে লইয়া গিয়া আমাদের জীবনকে দুঃখময় করিয়া তোলে।

একদিন আমার একটি বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার মেয়েটি মা-বাপের বড়ই আদরের ধন। সে আমাকে খুবই ভক্তি করে, আমিও তাহাকে খুব একটা স্নেহের চোখে দেখিয়া থাকি। আমি যখন সেখানে গেলাম তখন আমার গলার আওয়াজ শুনিয়া সে গা' ধুইতে গেল। সেদিন আমার বেশী সময় ছিল না, একঘণ্টা বসিয়া সেখানে কথাবার্ত্তা বলিয়া আমাকে বাধ্য হইয়া চলিয়া আসিতে হইল। মেয়েটি তখনও আমার নিকট আসিবার সুযোগ পাইল না। মেয়ের মা বলিলেন, 'আপনার দেখা না পাইলে খুকী খুব কান্নাকাটি করিবে, আপনি আবার কখন এদিকে আসিবেন?' আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম, 'যেদিন আমার দর্শনলাভের মূল্যটা আপনার খুকীর নিকট তাহার গা ধোয়া পাউডার মাখা আদির মূল্য হইতে এক পয়সাও বেশী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে মনে করিব সেদিন আমি আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিব।' আমার কথাটা যে খুব রুক্ষ হইয়াছে, প্রেমানন্দের মুখে যে এইজাতীয় কথা শোভা পায় না তাহা বুঝিয়াও কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া এইরূপ একটা অভিমত প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। কোন্ জিনিসটার কত দাম হওয়া উচিত তাহা

কি আমরা সব সময় ভাবিয়া দেখি ? আমরা আমাদের বুদ্ধির দোষে কতরূপে কতভাবে যে বঞ্চিত হই তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিবারও যে সুযোগ পাই না। বর্ত্তমান সভ্যতার ধর্ম্মই হইয়াছে বাহিরে আচারব্যবহারে কথাবার্ত্তায় এমনভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়া যে, ভিতরের প্রাণটা সদ্ভাবগুলি দেখা দেখিতে চেষ্টা করা আর আমাদের অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। শ্রীকৃষ্ণের মহাদেবের বুদ্ধের শঙ্করের যীশুর মহম্মদের চৈতন্যের নানকের রামমোহন রায়ের জীবনগুলির দিকে আমরা আর ততটা তাকাইয়া দেখি না, তাঁহাদের বাহ্যিক আচারব্যবহার বাহিরের মতের কল্পিত আবরণ যেন আমাদিগকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—আমরা মন্দিরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া ঠাকুর দেখিবার ঠাকুরকে পাইবার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। পৌত্তলিকতা আর কাহাকে বলে ? বাহ্যিক অসারতায় আমরা এতটা মোহিত হইয়া পড়িয়াছি যে, ভিতরের সার পদার্থের দিকে চাহিয়া দেখিবার আবশ্যকতাও অনেক সময় আমাদের মনে হয় না। ভিতরের দিকে প্রাণের দিকে প্রকৃত ভাবের দিকে চাহিয়া না দেখিয়া শুধু বাহিরের অসার চাকচিক্যে মোহিত থাকার প্রবৃত্তিটাই তো আমাদের দেশকে বিনাশের পথে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের এখন মা-মাসী ভাল লাগে না, ভাল লাগে থিয়েটার-বায়স্কোপ ; সাধু মহাত্মা হিতৈষী আত্মীয়-স্বজন ভাল লাগেনা,

ভাল লাগে বিলাসের উপকরণ—মৌখিক কপট বন্ধুদের সংসর্গ। ইহা যে কি সর্ব্বনাশের কথা, ইহার মূল যে কোথায় তাহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। উচ্ছৃঙ্খলতার একটা প্রবল তরঙ্গে এদেশের প্রাচীন আর্য্যসভ্যতাও যে ভাসিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা একটু তলাইয়া ভাবিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক। যে অর্থকে অনর্থ বলিয়া ভাবিতে শঙ্কর উপদেশ দিয়াছেন 'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্', যে ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ ভয়ানক কঠিন বলিয়া যীশু ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, সেই অর্থই হইয়া পড়িয়াছে এখন সারসর্ব্বস্ব। যাহাদের সঙ্গে একদিন আমাদের খুব ভাব ছিল তাহারা টাকা হইলে আর আমাদিগকে চিনিতে পারে না, আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। বড় লোকের অপদার্থ ছেলেমেয়েগুলিকে আমরা যতটা আদর যত্ন দেখাইতে যাই, গরীবের ভাল ভাল ছেলেমেয়েকে কি আমরা ততটা ভালবাসার চোখে দেখিয়া থাকি, তাহাদিগকে কি আমরা ততটা আদর-যত্নের সহিত গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হই? ভিতরের মনুষ্যত্বের বিকাশ অপেক্ষা বাহ্যিক অসার চাকচিক্যের দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমরা মানুষের ভিতরটা দেখি না প্রাণটা দেখি না মনটা দেখি না হৃদয়ের সদ্ভাবগুলি দেখি না, দেখি কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য্য পোষাকের পারিপাট্য, মুখের বাক্‌চাতুর্য্য-ছল কপটতা প্রভৃতি। আমরা এখন যে একেবারে অসার বাহ্যিক

আড়ম্বরের বিশেষ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছি। প্রাণটা আছে কিনা মনুষ্যত্ব আছে কিনা সেদিকে না চাহিয়া, যাহার অর্থবল আছে তাহাকেই সাধু পণ্ডিত গুণী জ্ঞানী বলিয়া প্রশংসা করিতে ভক্তি করিতে পূজা করিতে ভালবাসি। যে বাহ্যিক অনাবশ্যকীয় উপকরণগুলি আমাদিগকে একান্তভাবে পাইয়া বসিয়াছে, অর্থই যে সে সব উপকরণ সংগ্রহে সমর্থ!

বাহ্যিক সভ্যতারূপী ভূতগ্রস্ত হইয়া আমরা একবারও যে ভিতরের সার পদার্থের দিকে চাহিয়া দেখিবার সুযোগ পাই না। প্রকৃত সার পদার্থ, প্রকৃত সত্য রহিয়াছে ভিতরে, অন্তরে—অন্তরেরও অন্তরে—'অন্তরাদন্তরং জ্ঞেয়ং নারিকেলফলাম্বুবৎ',—প্রকৃত জ্ঞেয় পদার্থ রহিয়াছে ভিতরেরও ভিতরে, সার অমৃতরূপে; শুধু বাহিরের খোসায় ভুলিয়া বাহিরের খোসা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে কি আর সে অমৃতরস আস্বাদ করা যায়? এই জন্যই তো পাশ্চাত্য সভ্যবৃন্দ এবং তাহাদের ভারতীয় ভক্তগণ প্রাচ্য আর্য্য সভ্যতার বাহিরের খোসা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়া খোসাটাকে সময় সময় একটু কামড়াইয়া লইয়া ভিতরের সার পদার্থের সন্ধান না পাইয়া এগুলি নিজের বুদ্ধির দোষে অসার বলিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া এইভাবে বঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই যে আমরা হীরা ফেলিয়া কাচে আসক্ত হইয়া পড়িতেছি, সোনা ফেলিয়া গিল্টি নিয়া তৃপ্তি বোধ করি, ইহার পরিণাম কোথায় তাহা কি আমরা একবারও ভাবিয়া

দেখি ? সুখের সময় আরামের সময় এই সব অসার দ্রব্য-গুলি কৃত্রিম বন্ধুগুলি লইয়া তৃপ্ত থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলেও, বিপদের সময় দুঃখের সময় ইহারা যে কি ভাবে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিরাশসাগরে দুঃখকূপে পতিত করিবে, সময় থাকিতে তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। মাও রান্না করে খাওয়ান, চাকর চাকরাণীও রান্না করে খাওয়ায়, বিশেষ বিশ্বাসী চাকর হইলেও তাহার রান্নায় ও মার রান্নায় যে একটা বিশেষ পার্থক্য থাকিয়া যায় তাহা কি আমরা একবারও বুঝিতে চেষ্টা করি ? চাকরের হাতের খাদ্য অন্নময় কোষের পুষ্টি সাধন করিতে পারে কিন্তু মায়ের হাতের খাবারগুলির মধ্যে যে প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময়, এমন কি আত্মারও পুষ্টিকর আনন্দপ্রদ খাদ্যগুলি বর্ত্তমান, তাহা কি আমরা চাকরের প্রস্তুত খাদ্যের মধ্যে আশা করিতে পারি ? যে সন্তান মার রান্নার ভিতরে এই বিশেষত্বটুকু অনুভব করিতে পারে না সে যে একান্তই স্থূলদর্শী, মূর্ত্তিপূজক অকৃতজ্ঞ। মাও অসুস্থ অবস্থায় সেবা করেন, চাকর চাকরাণী এবং nurseও সেবা করে, প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তির পক্ষে ইহার পার্থক্যটা হৃদয়ঙ্গম করা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। মা-মাসীর আদর ও পরের আদর, ইহার ভিতরে মস্ত একটা প্রভেদ দেখিয়াই তো লোকে বলিয়া থাকে 'মার চেয়ে বেশী মায়া তারে বলে ডাইন্'। বর্ত্তমান সময়ে এই সুসভ্য সুসজ্জিত মিষ্টভাষী সর্ব্বনাশকারী পূতনারূপী

ডাইন হইতে আমাদের সুকোমলমতি বালক-বালিকাগণকে বাঁচাইয়া রাখিবার একটা সুব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। মার ভিতরে রহিয়াছে বাৎসল্যভাব স্বার্থত্যাগ সরলতা মধুরতা প্রেম সোহাগ, পূতনার ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায় বিষেভরা স্বার্থপরতা ছল-চাতুরী—ভালবাসার একটা কপট অভিনয়। যে স্বাভাবিক সুন্দর তাহার যে আর বাহ্যিক ভূষার সাজ-গোজের দরকার হয় না। "ভূষাভিঃ কিং সুন্দরো যঃ প্রকৃত্যা"। অস্বাভাবিক ভাবে সুসজ্জিত হইয়া ভিতরের যাবতীয় ময়লা চাপা দিয়া বাহিরে সুন্দরভাবে প্রতীয়মান হইয়া পরকে মোহিত করা, পরের মন ভুলাইয়া পরকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করা, আমাদের মা-ভগ্নীদের শোভা পায় না। এসব লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন তামসিক নাচ-প্রকৃতির স্বার্থপর পূতনাদের দল। আমাদের মা-ভগ্নীগণ এই সব বাহ্যিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভিতরকার সৌন্দর্য্যের সদ্ভাবের ভগবৎভাবের দাম অনেক বেশী মনে করিবেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম ভালবাসা স্বার্থত্যাগ পবিত্র নিস্বার্থ আদর-সোহাগ শুভ বাসনা যে অপার্থিব স্বর্গের সামগ্রী—উহারা স্বর্গ হইতে আসিয়াছে মর্ত্তবাসীকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য। বড়ই দুঃখের কথা, আমরা বাহিরের সৌন্দর্য্যে বাহ্যিক চাক্‌চিক্যে এতই বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছি যে, ভিতরের সৌন্দর্য্যের দিকে একবারও চাহিয়া দেখিবার সুযোগ পাই না। এক শিশি

সুগন্ধি আতরের লোভে একখানা বিলাতী কাপড়ের খাতিরে একখানি অসার ছবির বইয়ের প্রলোভনে আমরা আমাদের আপনা জনের আদর-সোহাগ নিস্বার্থ ভালবাসার কথা একেবারে ভুলিয়া যাই। যে মা এত করিয়া মানুষ করিল, যে মা শরীরের রক্ত জল করিয়া ছেলেমেয়েদিগকে মানুষ করিল, যে মা ছেলেমেয়েদের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা নিজের যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া সুখী, যে মায়ের নিকট ইহারা অন্ধের যষ্ঠি নয়নের অঞ্জন সুখের সুখ জীবনের সার পদার্থ সমস্ত আশা ভরসার মূল প্রস্রবণ, সে মায়ের সমস্ত স্বার্থত্যাগ ভালবাসা শুভ কামনা যে এখন এক শিশি আতরের, সামান্য বায়স্কোপ ও থিয়েটার দেখার প্রলোভনের নিকট অসার বলিয়া ত্যাজ্য হইতে বসিয়াছে! যে মা জগৎমাতার জীবন্ত বিগ্রহ, যে মার প্রেম-ভালবাসার তুলনা নাই, সে মার আহ্বানকে স্মৃতিকে আদর-সোহাগকে যাহারা এইভাবে অস্বীকার করিতে অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারা যে প্রলোভনের হাতে পড়িয়া কোথায় চলিতেছে কোথায় ঘুরিতেছে, তাহার যে কি ভীষণ পরিণাম তাহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। রোগের সময় বিপদের সময় এসব ভোগসামগ্রী, এসব সাময়িক স্বার্থপর বন্ধুবান্ধব যে কোথায় চলিয়া যাইবে, কিরূপ উদাসীন হৃদয়হীনভাবে ব্যবহার করিবে, সময় থাকিতে তাহা একটু বুঝিতে পারিলে এসব ছেলেমেয়েদের অনেকটা অনুতাপের ভিতর দিয়া ফিরিয়া আসিবার সুযোগ জুটিত। সন্ধ্যাবেলা পাহাড়ের উপরে ম্যাল রোডের সান্ধ্য মিলন

সাজসজ্জা হাবভাব বাহ্যিক চাকচিক্য আড়ম্বর ছলকপটতা ও প্রলোভনের ছড়াছড়ি মাতামাতি পাশ্চাত্য সভ্যদের তাহাদিগের ভক্ত শিষ্যপ্রশিষ্যাদির নিকট মহা আদরের জিনিস সভ্যতার পরিচায়ক হইলেও, ইহা যে ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার মূলে কি ভাবে কুঠারাঘাত করিতে বসিয়াছে তাহা কি আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি? ইহাদের পরিণাম ভাবিতে গেলে যে একেবারে অস্থির হতাশ হইয়া পড়িতে হয়! এই সব ছেলে-মেয়েদের কাছে মা-বাপ ভাই-বোন স্বামী-স্ত্রী আত্মীয়স্বজনের সেবার, দেশের কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগের, আদর্শ জীবনলাভের জন্য উপযুক্ত সাধনা করার আশা যে একান্তই দুরাশা মাত্র। আর এই সব মেয়েরা যে পরিণতবয়সে স্বামীর সেবা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা আত্মীয়স্বজনদের সেবার জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে পারিবে, পরের সুখের জন্য নিজের সুখস্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া আপনাদের ভিতরে আদর্শ মাতৃত্ব স্ত্রীত্ব স্ত্রীজাতির প্রকৃত মহত্ত্ব ফুটাইয়া বাহির করিয়া আদর্শ দেবীরূপে পরিগণিত হইতে সচেষ্ট হইবে, তাহা যেন কোনও মতেই সম্ভবপর মনে হয় না। ইহারা বিবাহিত-জীবনে নিজেরা সুখে তৃপ্ত থাকিয়া আত্মীয়স্বজনদের সুখের কারণ হইতে সক্ষম হইবে কিনা, তাহাতেও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।···সেদিন একটি মা বলিলেন যে, তিনি তাঁহার ছেলে-মেয়েদের রাত দশটার আগে নিজের কাছে যাইতে দেন না।

সকলকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়াই নাকি তাঁহার প্রধান কাজ…… চাকরদের খাটাইতে হইবে, চাকরদের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইতে হইবে ; তাহাদিগকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া তোলাই নাকি তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম ! তখন বলিতে ইচ্ছা হইল যে কর্ত্তব্যজ্ঞানটা কি কেবল চাকরদের জন্যই প্রয়োজনীয়, আমাদের নিজদেরও কি একটু কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে চেষ্টা করা উচিত নহে ? সংসারে মার কর্ত্তব্য, স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি একটা সহজ কথা ? শুধু দু'খানা নভেল লইয়া সাজ-পোষাক লইয়া বায়স্কোপ-থিয়েটার লইয়া বাজে গল্প লইয়া সময় কাটাইলেই কি ইহাদের সব কর্ত্তব্য সাধিত হইয়া যায় ? এই ভাবে কি কেহ আদর্শ মাতৃত্ব আদর্শ পত্নীত্বলাভে সক্ষম হয় ? চাকরকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ করিতে গিয়া তুমি যে মার কর্ত্তব্যপালনে কতটা অবহেলা করিতে বসিয়াছ তাহা কি একটুও তোমার মনে পড়ে ? ভগবান তোমাকে হাত-পা দিয়াছেন কি চাকর দ্বারা সব কাজ করাইয়া লইবার জন্য ? ভগবান তোমাকে মা করিয়াছেন কি দাই দ্বারা তোমার ছেলেমেয়েদেরে দুধ খাওয়াইবার জন্য, চাকর-চাকরাণী দ্বারা ইহাদের লালনপালন করাইয়া লইবার জন্য ? এইভাবে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে সব কর্ত্তব্যে অবহেলা উদাসীনতা নিজের কাজ পরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কি আদর্শ মাতৃত্ববিকাশের ভগবৎইচ্ছা-পূরণের সহায় ? তোমরা অজ্ঞাতসারে যে কি ভাবে তোমাদের ছেলেমেয়েগুলিকে হাত-

ছাড়া করিয়া পর করিয়া তুলিতেছ, তাহা তোমরা কি একবারও ভাবিয়া দেখ? আমার হাত আমার কাপড় ধুইতে অক্ষম, আমার কাপড় ধুইবে আমার চাকরের হাত, আমি সর্ব্বতোভাবে হইয়া পড়িব আমার চাকরের অধীন চাকরের গোলাম! বল তো ইহা কি কম পরিতাপের কথা? তোমরা যাহাদের সভ্যতা অনুকরণ করিতে ব্যস্ত, তাহারা যে স্বাবলম্বন স্বাধীনভাব কতখানি ভালবাসে তাহা কি তোমরা একবারও ভাবিয়া দেখ? তাহারা কত কাজ করে কত ভাবে, তাহা একটু চোখ খুলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিও। আমরা বাস্তবিকই যে নিজের দিকে দৃষ্টি হারাইয়াছি, ভিতরের দিকে একবারও চাহিয়া দেখিনা। পরকে উপদেশ দিতে পরকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া তুলিতে আমরা তৎপর, কিন্তু একবারও নিজের দিকে চাহিয়া দেখি না: নিজের কর্ত্তব্যসাধনে মনোনিবেশ করি না।

আমাদের এই দৃষ্টিটাকে নিজের দিকে ভিতরের দিকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। ভগবান আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়াছেন জগতের স্থূল পদার্থ ভগবানের স্থূল বিভূতি দর্শন করিবার জন্য, মন দিয়াছেন সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুভব করিবার জন্য, বিজ্ঞান দিয়াছেন কারণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য, আত্মা দিয়াছেন পরমাত্মায় আত্মনিবেদন করিয়া আমাদের জীবত্বকে জন্মকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য। আমরা যে কিছুই ভাল করিয়া দেখি না। স্থূলে এতটা সীমাবদ্ধ হইয়া

পড়িয়াছি যে ভিতরের তত্ত্বদর্শন করিতে, এমন কি ভিতরের স্বরূপ উপলব্ধি করিতেও আমাদের সুযোগ-সুবিধা জুটিয়া উঠে না। স্থূলও কি আমরা ঠিক ভাবে দেখি, না দেখিতে চেষ্টা করি? স্থূলের একটা প্রাতিভাসিক কল্পিত রূপ লইয়াই যে আমরা একেবারে মাতিয়া বসিয়াছি। স্থাণুতে পুরুষ, শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প, ভালতে মন্দ মন্দে ভাল, সত্যে অসত্য অসত্যে সত্য বুদ্ধি আমাদিগকে এমনভাবে ভুলাইয়া রাখিয়াছে যে, আমরা সারকে অসার বলিয়া একেবারে দূরে রাখিয়া দিয়াছি; এবং অসারকে সার বলিয়া তাহার পিছনে উন্মত্তভাবে ধাবিত হইয়া পদে পদে বঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিয়াছি। ভুল যে আমাদিগকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে! বাহ্যিক চুণকামের আবরণে কোনও জিনিসকেই যে আমরা ঠিকভাবে দেখিতে পাই না। এই প্রাতিভাসিক ভ্রম দূর করিয়া প্রথমতঃ আমাদিগকে অন্নময় কোষটিকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার পরে প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় কোষগুলি পর পর ভেদ করিয়া সর্ব্বভূতে আত্মাকে পরমাত্মাকে দর্শন করিতে না পারিলে যে আমাদের কিছুই দেখা হইল না।

হে রুদ্র, তুমি কঠিন আঘাতে জোর করিয়া আমাদের হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দাও, আমাদের এই মোহবন্ধন ছিন্ন কর; —বাহিরের দিক হইতে আমাদের চিত্তকে জোর করিয়া

তোমার দিকে আকৃষ্ট কর। তোমার প্রিয় সন্তান কায়া ভুলিয়া ছায়া লইয়া সার ভুলিয়া অসার লইয়া সুধা ভুলিয়া গরল পান করিয়া আর কতদিন এইভাবে দুঃখ-ভোগ করিবে? তুমি তো সত্যস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ, তুমি আমাদিগকে অসতের এই প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া তোমার সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপের দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লও। তুমি তো দেখা দিবার জন্য ধরা দিবার জন্য তোমাকে লইয়া আনন্দ করিবার জন্য তোমাকে উপভোগ করিবার জন্য এই বিচিত্র জগৎ সৃজন করিয়াছ। আমরা যে তোমার উদ্দেশ্য নিস্ফল করিতে বসিয়াছি! তুমি রুদ্রমূর্ত্তিতে আমাদের দরজা খোল, আবরণ দূর কর; তোমাকে দেখিবার জানিবার পাইবার ভোগ করিবার সামর্থ্য প্রদান করিয়া আমাদের জীবন সার্থক কর, তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ কর।

মানুষ চেনা বড়ই কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ এইযুগে যখন আমাদের ভিতরে বাহিরে এমন একটা অস্বাভাবিক পার্থক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাহিরটা স্থূলটা
আত্মীয় দেহটা সৃষ্টি হইয়াছে রহিয়াছে শুনিতে পাই ভিতরটা সূক্ষ্ম ভাবটা মানসিক অবস্থাটা প্রকাশ করিবার জন্য। জগৎটা নাকি সৃষ্ট হইয়াছে ব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার জন্য। কিন্তু আজকালকার অবস্থা দেখিলে মনে হয় দেহটা বাহিরটা সৃষ্ট হইয়াছে মনটাকে মানসিক ভাবকে ভিতরের অবস্থাকে আবরণ করিবার জন্য। সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম প্রকাশ করা, তমোগুণের ধর্ম্ম আবরণ করা; তাই যে যুগে আবরণের ভাব বেশী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে আমরা তামসিক যুগ বা কলিযুগ বলিয়া মনে করি। আমি আমার কথা ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইব, ইহাই তো হইতেছে স্বাভাবিক অবস্থা; আর যেখানে আমার কথা ভাব ও কাজ আমাকে প্রকাশ না করিয়া আমাকে ঢাকিয়া রাখিবে, সেখানে যে বড়ই একটা অস্বাভাবিকতা কপটতা দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কথা

ভাব ও কাজে সামঞ্জস্য কম সেখানে আমরা আদর্শ মনুষ্যত্ব খুঁজিয়া পাইনা—পদে পদে বঞ্চিত প্রলোভিত প্রতারিত হইয়া থাকি। বর্ত্তমান যুগ নাকি কেবল বাহ্যিক চূণকাম করার যুগ। আমার ভিতরে যাহাই থাকুক না কেন, বাহিরে আমাকে বেশ সুন্দরভাবে সভ্য সাজিয়া থাকিতে হইবে। ভিতরে হাজার মণ ময়লা থাকুক না কেন, বাহিরে একটা সভ্যতার আবরণ দেখিতে দেখাইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। যে আমার পরম শত্রু যে আমাকে ঘৃণা করে সেও যে বাহিরে একজন মিত্রের ভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কথা বলিতে কাজ করিতে আরম্ভ করে! এজন্য আজকাল মানুষ চেনা বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে; তাই বাহিরের কথায় বাহ্যিক ব্যবহারে মোহিত হইয়া লোককে আপনা মনে করিয়া আত্মীয় মনে করিয়া আমরা পদে পদে বঞ্চিত হই, অনেক সময় অনুতপ্ত হইয়া পড়ি। বাহিরে সভ্য হইলেও ভিতরে এমন মিথ্যাবাদী কপটাচারী হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদের কথায় ভাবে বা কাজে বিশ্বাস করিতে গেলে অনেকেরই যে প্রতারিত হইতে হইবে। আমরা কথা বলিয়া সেই কথা ঠিক রাখাকেও সব সময় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি না। চব্বিশ ঘণ্টা এমন একটা সভ্যতার পোষাকে কোমল ভাষার আবরণে আবৃত থাকি যে, আমাদের মানসিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিয়া লওয়া একটা কঠিন ব্যাপার হইয়া

পড়িয়াছে। যেখানে প্রকৃত সত্য বাস করে যেখানে প্রকৃত ধর্ম্ম অবস্থিত যেখানে প্রকৃত প্রাণের টান রহিয়াছে, সেখানে বেশী বাহ্যিক চাকচিক্য কপট সাজ-গোজের ভাব তামসিক কপটতার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই যাহারা আমাদের প্রকৃত আত্মীয় প্রকৃত বন্ধু প্রকৃত হিতৈষী, তাহাদের ব্যবহার অপেক্ষা অনেক সময় বাহিরের সাময়িক পরিচিত লোকদিগের কপট বাহ্যিক ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাহাদিগকে পরম আত্মীয় মনে করিয়া অনেক সময় বঞ্চিত প্রতারিত লাঞ্ছিত হইয়া থাকি। যেখানে এখনও সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে নাই, সেখানকার লোকদের বাহ্যিক রুক্ষ ব্যবহারের পিছনে অতি সুন্দর একটা প্রাণের ভাব সহৃদয়তার ভাব দেখিয়া অনেক সময় আমরা বিমোহিত হইয়া যাই। যেখানে প্রাণ আছে যেখানে প্রকৃত ভালবাসা প্রকৃত সৌন্দর্য্য আছে সেখানে বাহ্যিক আবরণের বাহ্যিক সভ্যতার ততটা আবশ্যক আছে বলিয়া মনে হয় না। যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত তাহার আর বাহ্যিক বেশ-ভূষার কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। একজন সাধক বলিতেন 'হীনচরিত্রের লোকদিগকেই সব সময় সাজিয়া থাকিয়া লোকের মনোহরণ করিয়া লোকের চোখে সুন্দর বলিয়া পরিচিত হইবার দরকার'। তাঁহার মতে ধার্ম্মিক পবিত্র সরলচেতার বাহ্যিক বেশ-ভূষার তত প্রয়োজন থাকে না।

আজকাল ঠিক ভাবে মানুষ চিনিতে না পারিয়া অনাত্মীয়কে আত্মীয় মনে করিয়া প্রকৃত আত্মীয়কে পর ভাবিয়া আমরা যে পদে পদে বিড়ম্বিত হই তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার একজন বন্ধু পিতামাতার শত অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পিতামাতা ছাড়িয়া দূরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। হঠাৎ যখন তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে জোর করিয়া দাতব্য-চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দেন—শত অনুরোধ করিয়াও তিনি তাঁহার বিখ্যাত বন্ধুদের মুখ দেখিতে সক্ষম হন নাই। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁহার মা-বাপ তার পাইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। দৌড়িয়া গিয়া যেভাবে তাঁহারা সন্তানকে জড়াইয়া ধরেন, যে ভাবে সন্তানের সেবাশুশ্রূষা আরম্ভ করেন, তাহা দেখিয়া রোগী নিজে এবং সেখানকার অন্য সকলে বিমোহিত হইয়া যান। মরিবার পূর্ব্বে আমাকে বলিয়া যান "ভাই কি করিব? মা-বাপ যে কি জিনিস এতদিনে তাহা বুঝিয়ছি, এপর্য্যন্ত কপট বন্ধুদের বাহ্যিক আত্মীয়তায় ভুলিয়া গিয়া এমন রত্নকে অবহেলায় তুচ্ছ করিয়াছি। সংসারে যদি দেবতা থাকেন তবে তাহা মা-বাপ। আজ আমার এই দুঃখ রহিয়া গেল যে, এমন জীয়ন্ত দেবতাকে চিনিয়াও তাঁহাদের সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত রহিয়া গেলাম"।

প্রাচীন ঋষিগণ এজন্য কে প্রকৃত বান্ধব তাহা নির্ণয় করিবার বেশ সুন্দর একটা লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। "উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে। রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥" যিনি সম্পদে বিপদে দুর্ভিক্ষে রাজ্যবিপ্লবে রাজসভায় ও শ্মশানে আমার কাছ ছাড়া হন না, তিনিই বাস্তবিক আমার বন্ধু। সম্পদের সময় যে অনেক বন্ধু আসিয়া জুটে তাহা সকলেই জানে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোককেই বিপদের সময় কাছে দেখিতে পাওয়া যায়। 'সুসময় অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময় হায় হায় কেহ কারো নয়', এটা যে বাস্তবিকই একটা মস্ত সত্য কথা। আজকালকার দিনে বন্ধুগণ সুদিনে সহায় হইয়া নানাবিধ কাজে উৎসাহিত করিয়া যথাসর্ব্বস্ব খরচ করাইয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিয়া কি ভাবে দূরে সরিয়া পড়েন দূরে বসিয়া মজা দেখেন তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দুর্ভিক্ষের সময় অভাবের সময় যে অনেক বন্ধু আমাদিগকে চিনিয়াও চিনিতে পারেন না, এমন কি অনাবশ্যক বোধে কথা বলিতেও অপমান মনে করেন, ইহাও অনেকের নিকট একটা সুপরিচিত সত্য ঘটনা। রাজদ্রোহের সময় আমরা যে কি ভাবে বন্ধু দ্বারা প্রতারিত হই, স্বার্থহানির সম্ভাবনায় রাজকোপের ভয়ে আমরা যে অনেক সময় অযথা রাজরোষে পতিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত বন্ধুগণকে আশ্রয় দিতে সাহায্য করিতে কি ভাবে অনিচ্ছুক

হইয়া পড়ি, তাহার দৃষ্টান্ত প্রায় প্রতি জেলায় প্রতি সহরেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাকে আমরা ভক্তি করি আদর করি তোষামোদ করি, তিনি এইজাতীয় বিপদে পড়িলে আমাদের কয়জন ভক্ত যে তখন তাঁহাকে সাহায্য করিবেন আশ্রয় দিবেন তাহা আগে বুঝিতে পারিলে অনেকে পূর্ব্ব হইতে অনেকটা সাবধান হইয়া যাইত। রাজদ্বারে দণ্ডিত ব্যক্তিও রাজকোপের ভয়ে সমাজ হইতে বন্ধুগণ হইতে আশানুরূপ সাহায্য-লাভে যে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ নাই। মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তি হইতে কোনও সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, সে অবস্থায় শ্মশানে গিয়া তাহার আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করিতেও বেশী লোক সহজে তৎপর হন না। আসল কথা বিপদে না পড়িলে বন্ধুর পরীক্ষা হয় না। যিনি অভাবের সময় বিপদের সময় সহায় হন, তিনিই বাস্তবিক বন্ধু 'A friend in need is a friend indeed' প্রকৃত সৎবন্ধু জগতে দুর্লভ। একটী আদর্শ মিত্র লাভ যে পরম সৌভাগ্যের কথা। নকল বন্ধুর হাতে আমাদের যে কত-রূপে কতভাবে প্রতারিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত হইতে হয়, তাহার ঠিকানা নাই; স্বার্থে আঘাত পড়িলে অসুবিধায় পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে ইহাদের অনেকেই যে দূরে সরিয়া পড়িবেন তাহাতে আমাদের কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। শান্ত সমুদ্রে নৌকা চালাইতে খোস গল্পগুজব করিয়া আনন্দের সহায় হইতে

যাঁহারা প্রস্তুত থাকেন, তুফানের সময় বিপদের সময় যে তাহাদের অনেকেই দূরে সরিয়া পড়িবেন তাহা মনে বুঝিতে পারিলে আমরা যে অনেকটা সাবধান হইতে পারি।

হে আমাদের চিরসুহৃদ প্রিয়বন্ধু, তুমি যে সর্ব্বদা সকল সম্পদ-বিপদের মধ্যে থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ; তোমার বিগ্রহস্বরূপ মা-বাপ আত্মীয়স্বজন সাধুসজ্জনগণও তোমার স্বভাব পাইয়া তোমার ভাবে ভাবিত থাকিয়া আমাদের প্রকৃত কল্যাণসাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমরা যাহাতে মায়ার প্রলোভনে মোহের বশে কাল্পনিক স্বার্থপর বন্ধুগণকে পরমাত্মায় মনে করিয়া প্রকৃত আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে গিয়া পদে পদে বঞ্চিত লাঞ্ছিত প্রতারিত না হই, সে বিষয় তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর।

সাধুসন্ন্যাসী

* * আমাদের দেশে সাধু-সন্ন্যাসীদের যেরূপ আদর-যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে সাধুতার নকল করিতে গিয়া অনেকে যে আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ মা-বোন-দিগকে প্রতারিত করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? সাধুতার বেশ গ্রহণ করিলেই সর্ব্বত্র তাহার অবাধিত গতি, তাহার আর খাইবার পরিবার

কোনও ভাবনাচিন্তা থাকে না। সত্যকার ভিখারী আসিলে যেখানে আমরা দুইটি পয়সা দিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করি, সেখানে সেই ভিখারী সাধুর পোষাক পরিয়া আসিলে তাঁহাকে যে আট আনার পয়সা দিতেও আমরা কুণ্ঠা বোধ করি। কর্ত্তা-দের অনুপস্থিতিতে ভণ্ড কপট সাধুবেশধারী প্রতারকগণ যেভাবে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া মাদিগকে ছলে বলে কৌশলে অন্ততঃ ভয় দেখাইয়া অভিসম্পাতের ভয়ে অর্থ দান করিতে বাধ্য করিতেছে তাহাতে সমাজের কর্ত্তাদের শাসনকর্ত্তা-দের একটু বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। তারপর ঘর বাড়ী ছাড়িয়া সাধু হইলে যেরূপ রোজগারের সম্ভাবনা মনে হয়, সাধুগিরি গুরুগিরি করা যেরূপ আরামের ব্যবসা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে অনেক অনধিকারী ব্যক্তি যে সাধু সাজিয়া গুরু সাজিয়া লোককে প্রতারিত করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এই সব কপটনামধারী প্রতারক সাধুদের হাত হইতে সকলকে রক্ষা করিতে হইবে। এজন্য প্রকৃত সাধুতা কি জিনিস তাহা বুঝিয়া লওয়া দরকার। 'সাধয়তি পরকার্য্যং যঃ সঃ সাধুঃ' যিনি জীবের কল্যাণসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, স্বার্থপরতা আত্মসুখস্পৃহা বাসনা কামনা যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না তিনিই সাধু। 'যিনি ভোগস্পৃহা অর্থলোভ লোক-প্রশংসা বিষ্ঠার মত হেয়বোধে ত্যাগ করিয়া পরার্থে জীব-

হিতসাধনে, ভগবৎসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তিনিই সন্ন্যাসী। মনু যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ সন্ন্যাসীদিগকে জ্যোতিষীর ব্যবসা করিতে বহু শিষ্য করিতে অর্থাদি স্পর্শ করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। 'যতয়ে কাঞ্চনং দত্বা দাতাপি নরকং ব্রজেৎ' যে ব্যক্তি সন্ন্যাসী যতিকে টাকা দিবে তাহারও নরকে যাইতে হইবে ; একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, ইহা যে প্রাচীন ঋষিদের মত। আমরা সাধু-অসাধু বিচার করি আপন আপন মানদণ্ড দিয়া ; সুতরাং আমরা যে সাধু চিনিতে ভুল করিব তাহাই তো স্বাভাবিক। নিজে মলিন হইলে সেই বিকৃত লোক যে সকল দৃশ্যই বিকৃত ভাবে দেখিতে ভাবিতে প্রচার করিতে বাধ্য। প্রাচীনকালে সত্ত্বপ্রধান সাত্ত্বিকপ্রকৃতি লোকেরা সকলের ভিতরে একটা সাত্ত্বিক ভাবের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব দেখিয়া সাধু-অসাধু নির্ণয় করিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল ভগবানের দিকে, তাই যাহার ভিতরে ভগবৎভাবের বিকাশ দেখা যাইত তাহাকেই সাধু বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। এখন আমরা হইয়া পড়িয়াছি অনেকটা তামসিক দেহাত্মবাদী স্বার্থপর বহির্মুখ ভগবৎবিমুখ অর্থ-সর্ব্বস্ব, তাই সাধুদের ভিতরে এই সব ভাবের অনুকূল একটা তামসিক প্রকৃতি দেখিয়া ও তাহাদের সাহায্যে স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা ভাবিয়া সেদিকে আমরা অনেকটা আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। সেকালে কে কতটা জ্ঞানী সাধক ভক্ত প্রেমিক সত্যবাদী

জিতেন্দ্রিয় নিস্বার্থপর সর্ব্বভূতহিতে রত সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। এই সকল গুণ দেখিয়া আমরা মানুষকে সাধু বলিতাম। একালে কে কতটা মায়াবী কপট ঐন্দ্রজালিক আসুরিক, কে কতটা মারণ উচ্চাটন বশীকরণে সমর্থ, কে কতগুলি ঔষধ জানে মাদুলি-কবচ দিয়া আমাদের পাপক্ষয় করিতে অদৃষ্টের কুফল বদলাইয়া দিতে পারে, কাহার প্রভাবে অর্থাগমে সুবিধা মামলা মোকর্দ্দমায় জিতিবার সম্ভাবনা, সে দিকেই আমাদের বেশী দৃষ্টি ; এমন কি, সময় সময় কে কতটা গাঁজা মদ চরস ভাঙ্গ খাইয়া অনায়াসে হজম করিতে পারে তাহা দেখিয়াও আমরা সাধুসন্ন্যাসীর ক্ষমতা নির্দ্দেশ করিতে যাই! ইহার ফলে আমরা কতরূপে কত ভাবে যে বঞ্চিত হই তাহার ইয়ত্তা নাই।

মনে রাখিতে হইবে মা ও স্ত্রী থাকিতে তাঁহাদের কষ্ট দিয়া বিশেষতঃ তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া সাধু হইবার বিধান নাই। বাহ্যিক বেশ-ভূষায় মানুষ সাধু হয় না—কাপড়ের রং-বদলান যত সহজ মনের রং-বদলান তত সহজ নয়। ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া অন্ততঃ কয় বৎসর বিশেষ সংযম ও সাধনার মধ্য দিয়া না গেলে চিত্তের ময়লা দূর করিয়া সাধু ভাব উপার্জ্জন করা যে সহজ কথা নয় তাহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। গুরুগিরি ব্যবসা সাধুতে শোভা পায় না। একটু বেশীদিন সঙ্গলাভ করিয়া ভিতর-বাহিরের সব খবর না জানিয়া কাহাকেও সাধু

বলিয়া ভক্তি করিতে গেলে, কাহারও নিকট দীক্ষা নিতে গেলে যে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। প্রাচীন ঋষিমুনিগণ কেন যে গৃহস্থগণকে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। অনধিকারী যুবকগণ যাহাতে সন্ন্যাস লইয়া সহজে শিষ্য করিতে আরম্ভ করিয়া লোককে প্রতারিত করিতে না পারেন সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।...

স্বাভাবিক পরিণতি ও অস্বাভাবিক পরিণতিতে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইলে তাহা কখনও মিষ্ট হয় না। আজ কাল জোর করিয়া সাধু সাজা জোর করিয়া ভাব আনা, মুখে লম্বা লম্বা বেদান্তের গদ মুখস্থ করিয়া ভিতরে কদাচারের অনুষ্ঠান করা অনেক জায়গায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায় ভাবের পরিণতি দেখা যাইত নৃত্যে সমাধিতে, আর কোথায় এখন নৃত্যের পরিণতি হইতে বসিয়াছে ভাবে—আমরা জোর করিয়া নাচিতে নাচিতে এখন অচেতন হইয়া পড়ি! ইহা সমাধি নয়—ইহা সমাধির বিকৃতি, ইহা চেতনাশক্তির অভাবে জড়তাপ্রাপ্তি-বিশেষ। যেখানে পূর্ব্বে ভক্তিভাবের পূর্ণ পরিণতিতে মস্তক আপনা হইতে নত হইয়া পড়িত, সেখানে আজ পরের অনুরোধে প্রথার খাতিরে স্বার্থসিদ্ধির আশায় জোর করিয়া ভক্তির ভাব

আনিতে ভক্তি দেখাইতে চেষ্টা করা হয়। সম্মুখে আয়না রাখিয়া ভক্তিভাবের অভিনয়ে দক্ষতা লাভ করিতে চেষ্টা করা যে কি জিনিস, তাহা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চৈতন্যদেব ভগবৎভাবে বিভোর হইয়া হাসিতেন কাঁদিতেন নাচিতেন, কখনও অচেতন হইয়া পড়িয়া যাইতেন; এখন আমরা ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য সে সব ভাব নকল করিতে গিয়া যে ভাবে সজ্ঞানে নাচিতে হাসিতে কাঁদিতে আরম্ভ করি, সে অভিনয় দেখিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সাধু-সজ্জন দেখিলে, এমন কি অহংকারে স্ফীত মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর মস্তকও আপনা হইতে নত হইয়া পড়িত; সেখানে এখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসন্তুষ্টির সম্ভাবনায় অভিসম্পাতের ভয়ে সমাজের খাতিরে অনধিকারীর নিকটে বাহ্যিক নমস্কারের ভাণ করিতে গিয়া সময় সময় যে নমস্কার ব্যাপারটিকে একান্ত-ভাবে বিকৃত নিষ্ফল—এমন কি কলঙ্কিত করিয়া ফেলি, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। আজকালকার দিনে একটা কপটতার অভিনয় যেন সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নমস্কার করিতে করিতে যেমন অজ্ঞাতসারেও নমস্কারের একটা প্রবৃত্তি জন্মে তেমনি অভ্যাস বশে অনিচ্ছায় নমস্কার করিতে গিয়া যে আমরা নমস্কারের সমস্ত সৌন্দর্য্য নাশ করিয়া ফেলি, নমস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিফল করিয়া তুলি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একটা

বাহ্যিক কপটতার অভিনয় সর্ব্বত্র প্রবেশ করিয়া আমাদের পরিবার সমাজ ও দেশকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম আচার-ব্যবহারকে, এমন কি জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মতত্ত্বকে পর্য্যন্ত বিকৃত করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই নকলকে আসল ভাবিয়া অসৎকে সৎ মনে করিয়া যাহাতে আমরা প্রতারিত না হই সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

হে সত্যস্বরূপ পরমাত্মা, তুমি আমাদের এই তামসিক নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিয়া তোমার জ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশ করিয়া আমাদের যাবতীয় অজ্ঞানতা অন্ধবিশ্বাস ভয়ভীতি দূর করিয়া দাও! অপাত্রে ভক্তি দেখাইতে গিয়া আমরা যে অজ্ঞাতসারে পাপকার্য্যের সহায় হই, অপাত্রে অর্থাদি দান করিয়া আমরা যে তাহাদের কুকাজের প্রশ্রয় দিয় থাকি, অসাধুকে ভক্তি দেখাইতে গিয়া আমরা যে প্রকৃত সাধুকে অপমানিত ও বঞ্চিত করিয়া ফেলি, অসাধুকে সাধু সাজাইয়া সমাজের দেশের পরম অনিষ্টসাধন করিয়া বসি তাহা যেন আমরা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া লইতে সক্ষম হই। তোমাতে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তোমার বিধানকে যাঁহারা অমোঘ বলিয়া মানেন, তাঁহারা যে কুলোকের অসাধুর অভিসম্পাতকে ভয় করিতে পারেন না। তুমি যে দুষ্টের দমনে ও শিষ্টের পালনে সর্ব্বদা তৎপর। অভিসম্পাতের ভয় যে নাস্তিকতার পরিচায়ক তাহা বুঝাইয়া দিয়া তোমার ভক্তকে

তোমার বলে বলীয়ান, তোমার শক্তিতে শক্তিমান করিয়া তোল। তোমার ভক্ত যে অভয়প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহা যেন তোমার বিশ্বাসী ভক্তদেরে দেখিলেই বুঝিতে পারি। আমরা পদে পদে প্রতারিত হইতেছি, আমাদিগকে তোমার দিব্য দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ কর।

মূর্ত্তিপূজা

* * মানুষের বাহ্যিক বেশভূষা যেমন আমাদিগকে আকৃষ্ট করে মোহিত করে ভিতরটা না দেখিতে দিয়া বঞ্চিত করে, আদর্শ পুরুষদের আদর্শ অবতারদের বিগ্রহগুলিও আমাদিগকে সেই ভাবে অনেকটা বঞ্চিত করিয়া তোলে। মূর্ত্তিপূজার উদ্দেশ্য ছিল মূর্ত্তির ভিতর দিয়া অমূর্ত্তের পূর্ণের পূর্ণ আদর্শের কাছে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করা। এখন আমরা মূর্ত্তির বাহ্যিক আকারে সাজে গহনায় বাহ্যিক বেশভূষায়, পূজার অনুষ্ঠানে এতটা আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছি যে তাহার ভিতর দিয়া ভগবানকে উপলব্ধি করা ভগবৎভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করা তো দূরের কথা, একটা আদর্শ জীবনের ছায়া দেখিয়া আভাস পাইয়া আমাদের জীবনকে উন্নত করিতে চেষ্টা করার আবশ্যকতা পর্য্যন্ত সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মূর্ত্তিপূজায় আমরা একজন পূর্ণ আদর্শপ্রকৃতি মনুষ্যের বিগ্রহ

সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার জীবনটী তাঁহার জীবনগত ভাবগুলি তাঁহার জীবনের উন্নত লক্ষ্যটি লইয়া ধ্যান করিতে করিতে তদ্ভাবে পূর্ণরূপে ভাবিত হইয়া তদ্গুণে পূর্ণভাবে ভূষিত হইয়া তাঁহার ন্যায় আদর্শ জীবনলাভে সক্ষম হইয়া থাকি। মূর্ত্তিপূজা করিয়া একদিন সাধক একলব্য একটি মৃন্ময় দ্রোণ-বিগ্রহের নিকট দ্রোণাচার্য্যের সব ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মূর্ত্তি যদি মূর্ত্তকে ফুটাইয়া বাহির না করে, মূর্ত্তি যদি তাহার ভিতরকার মূর্ত্তের আদর্শে আমাদের আদর্শ জীবনগঠনের সহায় না হয়, ভক্ত যদি আরাধ্য দেবতার সাদৃশ্যলাভে বঞ্চিত থাকে, তবে সেখানে মূর্ত্তিপূজা যে শুধু পাথর-পূজা ছেলে-খেলা বই আর কিছুই নয়!

হে ভগবান, আমাদের পূজা আমাদের সাধন-ভজন যেন শুধু কতকগুলি ভাবহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠানবিশেষে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া আমাদিগকে আমাদের ইষ্টদেবের সাদৃশ্য লাভে ইষ্টদেবের ইচ্ছাপূরণে আমাদের পূর্ণতালাভের সচ্চিদানন্দবিকাশের, ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় হয়।

প্রাচীনকালে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ভগবৎইচ্ছা ভগবৎবিধান-গুলি অবগত হইয়া তাহা প্রচারিত করিয়া তদনুসারে জীব-সমূহকে অমৃতের সন্তানগণকে চালাইতে চেষ্টা করিয়া জীবের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন করিতে জীবকে ভগবানের আনন্দধামে লইয়া যাইতে মহা ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। জীব ছিল তাঁহাদের নিকট পোষাক পরা শিব, জীব ছিল তাঁহাদের আত্মার পরমাত্মার বিলাসবিভূতি, তাই তাহারা আত্মীয় ; এই জন্যই তাঁহারা নিজের কল্যাণের জন্য যতটা ব্যগ্র ছিলেন নিজের আনন্দলাভে যতটা সচেষ্ট থাকিতেন, সমস্ত জীবের কল্যাণসাধনে, সমস্ত জীবের আনন্দবিধানে ততটা চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা শাস্ত্রপ্রণয়ন আশ্রমস্থাপন ও সমাজপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সমাজ ছিল তখন আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র, জীবনের চালক—দুষ্টের শাসক শিষ্টের পালক ভগবৎধর্ম্মের সংস্থাপক। প্রাচীন সভ্যতা হইতে বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতনের তালে তালে আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিই

সমাজব্যবস্থা

বিকৃত হইতে আরম্ভ করিল। যে ব্রাহ্মণকে দেখিলে মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর মস্তক আপনা হইতে নত হইয়া পড়িত যে ব্রাহ্মণের চরণধূলি-লাভকে আপামর নরনারী পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিত, সেই ব্রাহ্মণ যখন ব্রাহ্মণোচিত গুণ-কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া অস্বাভাবিক ভাবে জোর করিয়া ছলে বলে কৌশলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিল, তখন যে তাহাদের দ্বারা চালিত সমাজে তাহাদের দ্বারা লিখিত শাস্ত্রে নানাপ্রকার বিকৃতি কলুষিত মত আসিয়া দেখা দিবে তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? এজন্য আদর্শ পুরুষ অবতারকল্প মহাত্মাগণ মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সমাজকে সমাজের বিধি-ব্যবস্থাকে শোধন করিয়া দেশের কল্যাণসাধনে, প্রকৃত ধর্ম্মসংস্থাপনে যত্ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিগত আট-দশ শতাব্দী হইতে এদেশে এজাতীয় মহাত্মাদের আগমন দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা সকলকে, সকল সমাজকে চালাইতে সক্ষম হন নাই; তাঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্যগণের সেরূপ উদার হৃদয় উন্নত প্রতিভা ও উদ্দীপ্ত তেজ না থাকায় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়গুলিও আস্তে আস্তে মলিনদশা প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে। এখন আমাদের দেশের সমাজগুলি এমনভাবে বিকৃত বর্ত্তমান দেশ-কাল-পাত্রের পক্ষে এমনভাবে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, উন্নত দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের কোনও শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করা ইহাদের পক্ষে

অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহাদের অর্থবল আছে যাঁহাদের শক্তিসামর্থ্য আছে, তাঁহারা এখন আর সমাজকে গ্রাহ্য করেন না ; এমন কি, সমাজই যেন তাঁহাদিগকে সুখী করিতে তাঁহাদিগকে গণ্ডির মধ্যে রাখিতে গিয়া তাঁহাদের যাবতীয় কদাচারগুলি বিকৃত ভাবগুলির অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়া দেশকে সমাজকে আরও বিকৃত আরও পতিত করিয়া তুলিয়াছে। যাহারা শক্তিমান যাহারা ধনী, তাহারা বাস করে সমাজের বাহিরে ; সুতরাং সমাজের পতনে তাহাদের বিশেষ কিছু আসে যায় না, বরং সমাজের পতিত অবস্থা অনেক সময় তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার সহায় হয়। সাধারণ লোককে বিশেষতঃ গরীবদিগকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সমাজ মানিয়া চলিতে হইতেছে, সামাজিক সকল প্রকার অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিয়া যাইতে হইতেছে ; সময় সময় ইহাদের দুরবস্থা দেখিলে পাষাণহৃদয় পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়া পড়ে। বিদ্যাসাগর রামমোহন দয়ানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিত হৃদয়বান মহাত্মাগণ সমাজসংস্কার করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ ফললাভ করিতে সক্ষম হন নাই। আজকাল সমাজের নেতা সমাজের বিধিব্যবস্থা সমাজের শাসন-প্রণালী—যে দিকেই চাহিয়া দেখা যায় সর্ব্বত্রই যেন একটা বিকৃতি, একটা কলুষিত স্বার্থপর অনিষ্টকারী অমঙ্গলপ্রসূ ভাবের ছায়া দেখিয়া হতাশ হইয়া যাইতে হয়! আহারবিহার বিবাহ-প্রথা জাতিভেদ গৃহ্য অনুষ্ঠান ও পূজা-পদ্ধতির যে বিশেষ-

ভাবে সংশোধন আবশ্যক তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিবেন না।

এই তো গেল আমাদের খাঁটি দেশী সমাজের অবস্থা। ইহার উপরে বিদেশ হইতে এদেশে যে ভাবের একটা সামাজিক-বিপ্লব রাষ্ট্রবিপ্লব ধর্ম্মবিপ্লবের ভীষণ প্রলয়ঙ্কর উচ্ছৃঙ্খল প্রবল বন্যা আসিয়া ভারতকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার হাত হইতে ভারতকে ভারতবাসীকে ভারতধর্ম্মকে প্রাচীন আর্য্যসভ্যতাকে রক্ষা করিতে হইলে আমাদের সমাজসংশোধনের জন্য যে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হওয়া দরকার, তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আজকাল পুরুষেরা যে ভাবে মেয়েদের নকল করিতে বসিয়াছেন, মেয়েরা যে ভাবে পুরুষদের বেশভূষা কার্য্য-কলাপ অনুসরণ করিতে সচেষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার ফলে দেশে যে কতকগুলি নপুংসকের সৃষ্টি হইয়া ভারতে নারীর নারীত্ব পুরুষের পুরুষত্ব প্রাচীন আদর্শসভ্যতাকে লোপ করিয়া ভারতের জগতের মহান অনিষ্টসাধন করিবে ইহা নিঃসন্দেহ।

হে রুদ্র, তুমি আমাদিগকে তোমার কাজের সহায় করিয়া লও। তুমি চালক না হইলে আমরা যে অনেক সময় হিতে বিপরীত করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। তুমি আমাদিগকে সেই শক্তি সেই তেজ, সেই বল, সেই প্রবৃত্তি,দান কর, যাহা অন্যায়কে কখনই যেন অনুমোদন

করিতে না পারে। তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছাপূরণে তোমার প্রিয়তম জীবের কল্যাণ সাধনে, 'তোমার স্বর্গরাজ্যস্থাপনে আমাদিগকে অধিকারী কর, বরণ কর সাহায্য কর।

* * *

শাস্ত্রে

প্রাচীন কালে শাস্ত্র পড়িতে হইলে বিদ্যা লাভ করিতে হইলে সংযত হইয়া অধিকারী হইয়া গুরুসেবা দ্বারা চিত্তকে অহংকার-বর্জ্জিত করিয়া তার পরে প্রকৃত তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট গিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত; ভগবৎকৃপায় গুরুর কৃপায় নিরহঙ্কার শিষ্যের নিকট বেদ তাহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া দিতেন। সাধনরাজ্যে অহংকার যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু, তাহা এখন যেন আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। এখন আমরা অহংকার-বলে নিজেরাই যেন সব বুঝিতে সক্ষম, গুরু তো একজন বেতনভোগী ভৃত্য সদৃশ—প্রাচীন শাস্ত্রাদির মধ্যে এমন কি তত্ত্ব থাকিতে পারে যাহা আমাদের বিজ্ঞান-উদ্ভাসিত বুদ্ধির নিকট অবোধ্য অগম্য রহিয়া যাইতে পারে! অবকাশ মত দুইএকখানি পুস্তকের দুইচারিটি পাতা পড়িয়া আজকাল

আমরা পণ্ডিত হইয়া পড়ি, তাহার পরে আমার ধন থাকিলে কে আর আমার সামনে দাঁড়ায়! ধনবলে আমার পক্ষে প্রায় সমস্ত পণ্ডিতগণকে আমার ভ্রান্ত মতের অনুবর্ত্তী করিয়া তোলা কিছুই কঠিন নহে। আমি যাহা বলিব কে তাহা খণ্ডন করে? দৈবদুর্ব্বিপাকে আজকাল এই দলের লোকই হইয়া পড়িয়াছে আমাদের দেশে শাস্ত্রে পণ্ডিত শাস্ত্রের প্রচারক। আমাদের কিন্তু কেবল মনে হয় উপনিষদের সেই শ্লোকটি, যেখানে ঋষি বলিয়া গিয়াছেন যে কেবল বেদপাঠ করিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা কিংবা বহুবার শ্রুত হইলেই বিদ্যা অধিগত হয় না; বিদ্যা যাহাকে উপযুক্ত অধিকারী মনে করেন, তাহার কাছেই তিনি আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যঃ তস্মৈ স আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥"

অনধিকারীর হাতে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িলে তাহার একটা বিকৃত ব্যাখ্যা কদর্য্য ব্যাখ্যা হওয়াই যে স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের কথা কে শুনে? সাধনের জন্য পূর্ণতালাভের জন্য আজকাল খুব কম লোকেই শাস্ত্রপাঠ করেন। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী শাস্ত্র মানে, অশাস্ত্রীয় কথা গ্রহণ করিতে দ্বিধা-বোধ করে; সুতরাং ইহাদেরে হাত করিতে হইলে ইহাদের চালাইতে হইলে, ইহাদের আপন সেবায় আপন কাজে লাগাইতে হইলে শাস্ত্রের কতক-

গুলি শ্লোক জানা দরকার ; তাই তো আমরা আজকাল সময় সময় শাস্ত্র পড়ি, অনেক কাজে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকি। যাহার যাহা মৎলব সে শাস্ত্র হইতে তাহার অনুকূল প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে ; নিজের মত-পোষণের জন্য নিজের স্বার্থ-পূরণের জন্য নিজের সম্প্রদায় বজায় রাখিবার জন্য আমরা আজ-কাল যতটা ব্যগ্র, প্রকৃত সত্যনির্দ্ধারণে ততটা ব্যগ্র হইলে আজ দেশের এরূপ দুরবস্থা দেখিতে হইত না। প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণের ফলে ভণ্ড প্রতারক কল্পিত অবতারগুলি বোধ হয় আজ আমাদিগকে এইভাবে প্রতারিত করিয়া আমাদের সমাজের দেশের এত অনিষ্টসাধন করিতে পারিত না। বিধবাকে মহাভারত পড়াইতে গিয়া একজন গুরু প্রমাণ করিয়া দিলেন, প্রাচীনকালে বিধবাবিবাহ হইত ; একজন স্ত্রীর পাঁচজন স্বামী হওয়াও শাস্ত্রসঙ্গত। ধনী মুসলমানের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আবার একজন প্রমাণ করিতে বসিলেন, প্রাচীনকালে এদেশে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত ছিল। নিজের মাংস খাওয়া মদ খাওয়াকে ভাল কাজ বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়া শাস্ত্র হইতে আমরা উপমা দেখাইতে আরম্ভ করিলাম, প্রাচীন ঋষিরা সোমরস পান করিতেন, বলরাম মদ খাইতেন। সে সময়ে সোমরস যে কি পদার্থ ছিল তাহা বুঝিবার শক্তি কোথায়, বুঝিতে চেষ্টা করার দরকারই বা কি ? যে কোন উপায়ে হউক নিজের উদ্দেশ্য পূরণ হইলেই তো যথেষ্ট

হইল। নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার পোষক শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিয়া যাহারা সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, তাহারা যে দেশের শত্রু ভগবানের শত্রু অসুর নামের যোগ্য, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন ইন্দ্রিয় বিকৃত থাকিলে মন স্বার্থ দ্বারা কামনা বাসনা সংস্কার দ্বারা রঞ্জিত কলুষিত মলিনীকৃত হইলে সত্যনির্দ্ধারণ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হওয়াই যে স্বাভাবিক। যাহারা আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা বিকৃত প্রভায় মোহিত হইয়া প্রকৃত আদর্শ প্রাচীন আর্য্যসভ্যতা ভুলিয়া গিয়া এই গরীব ভারতবাসীকে বিলাতী সাহেব করিয়া তুলিতে সচেষ্ট, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের হিন্দুশাস্ত্রের কতকগুলি বিকৃত ব্যাখ্যা মুখস্থ করিয়া একটা অস্বাভাবিক ভাবে এদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রচার করিতে শশব্যস্ত, শ্রীভগবানের কৃপা প্রাচীন আর্য্যঋষিদেব আশীর্ব্বাদ যেন আমাদিগকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করে। আমরা যেন প্রাচীন আর্য্যবিধান মতে শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়া দেশ-কাল-পাত্রানুসারে প্রাচীন আর্য্যসভ্যতাকে একান্ত আবশ্যক-বোধে সময়োচিত ভাবে একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া বর্ত্তমান সময়ের কতকটা উপযোগী করিয়া তুলিয়া সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সার মর্ম্ম আমাদের দেশে যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য প্রাচীন আর্য্য-

ঋষিগণের প্রাণের অভিপ্রায়গুলি পূর্ণভাবে সফল করিয়া দশের সমাজের দেশের কল্যাণের সহায় হইতে সক্ষম হই।

মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার সত্যস্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করুন, আমাদের সংস্কারগুলি বিকৃতিগুলি দূর করিয়া আমাদিগকে দিব্য দর্শন-শক্তি প্রদান করুন; আমরা যেন সত্যের নামে অসত্যকে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মকে সাধুর নামে অসাধুকে বরণ করিয়া নিজেরা প্রতারিত হইয়া অন্যকে প্রতারিত করিবার কারণ না হইয়া পড়ি। তন্ত্র ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রগুলি বেদের, উপনিষদের সার তত্ত্বগুলিকে এমন সুন্দরভাবে অনুভব-বেদ্য আস্বাদ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, ইহাদিগকে বেদের উপনিষদের ভাষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কালের প্রভাবে বিকৃত সমাজের স্বভাবে ইহাদের উপরে কতকগুলি বিকৃতি আবর্জ্জনা আসিয়া ইহাদিগকে অনেকের চোখে জঘন্য তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া আমাদিগকে বহুভাবে বঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। হে যোগেশ্বরেশ্বর! হে রসস্বরূপ! তুমি সমস্ত আগন্তুক ময়লা দূর করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত সাধন-রহস্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাদের সত্যাবধারণের সহায় হও!

বেদকে আমি কি ভাবে দেখি তাহার একটা আভাস দিতেছি। বেদ-শব্দ বিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, ইহার অর্থ জ্ঞান; বিদ্ ধাতুর অন্যান্য অর্থও জ্ঞানী জ্ঞানেই পর্য্যবসিত মনে করেন। সুতরাং বেদ ভগবানের চিৎবিভূতি, ইহা লেখা রহিয়াছে জগতের গায় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যেই; সৃষ্টিরহস্যের স্রষ্টার উদ্দেশ্যের সৃষ্ট্যাদির বিধানের মধ্যেই তিনি যেন নিজ হাতে এই বেদ লিখিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতি ভগবানের মূর্ত্তি, প্রকৃতি ভগবানের বিকাশের যন্ত্র Medium of manifestation, সুতরাং প্রাকৃতিক বিধানই ভগবৎবিধান; তবে প্রকৃতি যেমন কেবল স্থূলে পর্য্যবসিত নহে, প্রাকৃতিক বিধানও তেমনি স্থূলে সীমাবদ্ধ নহে; প্রকৃতির যেমন স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ভাব বা অবস্থা আছে, প্রাকৃতিক বিধানেরও তেমনি একটা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ভাব বা অবস্থা রহিয়াছে। এই প্রকৃতির অন্তরাত্মাই পরমাত্মা পরব্রহ্ম ভগবান আদি শব্দে বর্ণিত। প্রকৃত বেদ লেখা রহিয়াছে প্রকৃতির গায়, ঋষিগণ সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ

বেদ ও যজ্ঞ

করিয়া বেদের এই মন্ত্রগুলি বেদের ভিতরকার ভগবৎমনন-শক্তি সৃষ্টির বিধানগুলি স্রষ্টার রহস্যগুলি সাক্ষাৎকার করিয়া গিয়াছিলেন। "ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ স্মারকা ন তু কারকাঃ"। ভগবান যেমন নিত্য, ভগবৎবিধান ভগবানের চিৎবিভূতিগুলিও তেমনি নিত্য। ঋষিগণ শুধু তাহা প্রকৃতিগাত্রে দর্শন করিয়া নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন মাত্র। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন অনেকটা স্থূল তত্ত্ব, ঋষিরা সাধনবলে দেখিয়াছিলেন আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-তত্ত্বগুলি; এমন কি, তাহার উপরকার গুণাতীত তত্ত্ব পর্য্যন্ত। ব্যাসদেব সেই আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি সংগ্রহ করেন। কালে সেগুলি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, সেই তত্ত্বগুলি ঠিক সেই ভাবেই আমরা পাইতেছি। বিজ্ঞানও প্রকৃতির তত্ত্ব-আবিষ্করণে ব্যস্ত, সুতরাং বিজ্ঞান যে বেদেরই মহিমা প্রচার করিবে বেদের ব্যাখ্যানরূপে পরিগৃহীত হইবে বেদকে প্রমাণিত করিবে, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। বেদকে শুধু পণ্ডিতদের স্বীকৃত দুইচারিখানা গ্রন্থে সীমাবদ্ধ করিতে গেলে চলিবে না। যেখানে সাধক সিদ্ধ অবস্থা লাভ করিবেন, যেখানে সাধকের দিব্যচক্ষু খুলিয়া যাইবে, সেখানেই যে বেদের শ্রুতি আবিষ্কৃত হইবে।

বেদের দেবতাতত্ত্ব ও যজ্ঞতত্ত্ব অতি অদ্ভুত রহস্য। জগৎ-সৃষ্টি দেবতাসৃষ্টি যজ্ঞসৃষ্টি একই ছন্দে একই তালে অনুষ্ঠিত।

প্রকৃতি যেমন সৃষ্টিকালে মহদাদি-তত্ত্বে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, ভগবানের চিৎশক্তি সচ্চিদানন্দশক্তিও তেমনি তাহার প্রতি তত্ত্বে অনুস্যূত অনুপ্রবিষ্ট হইতে বসিল। ভগবান প্রকৃতির কোন্ স্তরে কি ভাবে প্রতিবিম্বিত বিকাশপ্রাপ্ত লীলাতৎপর, তাহা লইয়াই তো বেদের দেবতাতত্ত্ব। ভগবান ভগবৎচৈতন্য সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কোন্ পদার্থে কোন্ জীবে কি ভাবে বর্ত্তমান কি ভাবে বিকাশপ্রাপ্ত কি ভাবে আস্বাদ্য তাহা লইয়াই যে দেবতাতত্ত্ব; সুতরাং বেদোক্ত দেবতাতত্ত্বের আলোচনা অনুভূতি যে বিজ্ঞান-তত্ত্বের দার্শনিক-তত্ত্বের সাধন-তত্ত্বের আবিষ্কারের সহায়, তাহাতে আমাদের আর সন্দেহ নাই। আমরা এই দেবতাতত্ত্ব অবলম্বনে সাধনার ভিতর দিয়া পরব্রহ্ম-তত্ত্বে গিয়া পৌঁছিবার সুবিধা পাই। কর্ম্ম মাত্রই যজ্ঞ নামে অভিহিত। এই কর্ম্মের ভিতরেও একটা গুণাতীত ভাব, আর একটা কারণ-সূক্ষ্ম-স্থূল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যজ্ঞের অন্ন ও অন্নাদ রয়ি ও প্রাণ ভোগ্য ও ভোক্তার কতকটা আভাস আমরা বিজ্ঞানের motion (শক্তি) ও matter (ভূত)-তত্ত্বের মধ্যে দেখিতে পাই। ভগবানের ক্রিয়া হইতে জগৎসৃষ্টি, ভগবানের ক্রিয়া হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি (সহ-যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা), যজ্ঞেই সৃষ্টি বিধৃত যজ্ঞের দ্বারাই সৃষ্ট পদার্থ সৃষ্ট জীব পরিণতিপ্রাপ্ত। ব্রহ্ম যেমন এক হইয়াও অনন্ত, ব্রহ্মের ক্রিয়া ব্রহ্মের যজ্ঞরহস্যও ঠিক তেমনি এক হইয়াও

অনন্ত। একই ব্রহ্মযজ্ঞ, দ্রব্য-যজ্ঞ ভাবনা-যজ্ঞ প্রাণ-যজ্ঞ যোগ-যজ্ঞ জ্ঞান-যজ্ঞ আদি অনন্তভাবে বিভক্ত। বৈদিক ঋষিগণ যজ্ঞকে শুধু আগুনে ঘি-ঢালায় পর্য্যবসিত করেন নাই। চোখ রূপ গ্রহণ করে, ইহার মধ্যে বৈদিক ঋষিগণ যজ্ঞতত্ত্ব আস্বাদ করেন; রূপ-রূপ হবিঃ চক্ষুরূপ তেজস্তত্ত্বের মধ্য দিয়া গিয়া প্রাণ-মনস্তত্ত্বের মধ্য দিয়া আত্মারূপী যজ্ঞেশ্বরের নিকট পৌঁছিয়া থাকে। এইরূপ শ্রবণ স্বাদ স্পর্শাদিও যে যজ্ঞ তাহা অনুভব করিতে হইবে। শ্বাস গ্রহণ করিলাম তাহার মধ্যে প্রাণ-যজ্ঞ, নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম তাহার মধ্যে অপান-যজ্ঞ, আহার করিলাম তাহার মধ্যে দ্রব্যময়-যজ্ঞ, তত্ত্ব-চিন্তা করিলাম তাহার মধ্যে ভাবনাত্মক-যজ্ঞ, উপাসনা করিলাম তাহার মধ্যে ব্রহ্ম-যজ্ঞ—জগৎই যে যজ্ঞময় কর্ম্মমাত্রই যে যজ্ঞ। 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি' বিষ্ণু যেমন ব্যাপী যজ্ঞও তেমনই সর্ব্বভাবে সর্ব্ব কাজে পরিব্যাপ্ত। প্রতি কর্ম্মের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে পরিসমাপ্তি আবার ব্রহ্মে, এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলেই ব্রহ্মযজ্ঞে আমাদের অধিকার হইবে। গীতার 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ' এইভাবই প্রকাশ করে। সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞ হইলেও যে কর্ম্ম ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় তাহাই বিশেষভাবে যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যজ্ঞতত্ত্ব জানিতে পারিলে আমাদের সমস্ত চিন্তা সমস্ত ভাবনা সমস্ত বাসনা কামনা সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডকেই আমরা ভগবৎআরাধনায় পরিণত করিয়া পূর্ণতালাভের সহায় করিয়া তুলিতে পারিব।

ঋগ্‌বেদের দ্রব্যময় যজ্ঞ ও ভাবনাময় যজ্ঞের মধ্যে আমরা সর্ব্ববিধ অধিকারীব পক্ষে ক্রমোন্নতির ভিতর দিয়া সাধনভজনের নিম্নস্তর হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তরে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাই। দেবতাতত্ত্বের ভিতরে সর্ব্বত্র ব্রহ্মো-পলব্ধির যজ্ঞতত্ত্বের মধ্যে সকল কর্ম্মকে সকল ভাবনাকে উপাসনায় পরিণত করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবার যেন সুন্দর একটি প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রধান সত্য সর্ব্বাপেক্ষা সার তত্ত্ব এই যে জগতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই যে

বেদান্ত [illegible] আমরা। দড়িতে সাপ দেখি সাপ ভাবি দড়িকে সাপ বলিয়া প্রচার করি, ইহার মূলে রহিয়াছে আমাদের দর্শনশক্তির একটা বিকৃতি আমাদের চিত্তের মলিনতা আমাদের বিচারের ভুল। নতুবা দড়িতো আর আমার দেখার ভুলে সাপ হইয়া যায় না, যে দড়ি সেই দড়িই যে রহিয়া গিয়াছে। চৈতন্যদেব যখন জগৎকে কৃষ্ণময়

দেখিতেন, শঙ্কর যখন এই জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিতেন, তখনও তো অন্যে আমাদের মত জগৎকে এইরূপ বিকৃতভাবেই দর্শন করিত এইরূপ বিকৃতভাবেই বর্ণনা করিত। তাঁহারা দেখিতে শিখিয়াছিলেন দেখিতে জানিতেন, তাই খাঁটিভাবে দেখিতে পাইতেন। আমরা দেখিতে পাই না দেখিতে জানি না, তাই তো ভুলভাবে দর্শন করি ভুলভাবে মনন করি ভুলভাবে বর্ণনা করি। সকল অবস্থায় দৃশ্য পদার্থ কিন্তু ঠিক একভাবেই বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং এই ভুল দেখার বিকৃত ভাবে দেখার মূল কারণ রহিয়াছে আমাদের দ্রষ্টারই ভিতরে, বাহিরে দৃশ্যের মধ্যে নহে। এইজন্যই বোধ হয় জগৎ দেখাকে কতক পরিমাণে আয়নায় মুখ দেখার মত বলা হইয়া থাকে। দ্রষ্টার মুখ বিকৃত হইলে দর্পণের মধ্যস্থ দৃশ্যের মুখও যে বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। "বিশ্বং দর্পণ-দৃশ্যমান-নগরীতুল্যং নিজান্তর্গতম্"। সমস্ত বিকৃতভাবে দর্শনের উপলব্ধির বর্ণনার জন্য দায়ী থাকি আমি নিজে, দায়ী আমার বিকৃত ইন্দ্রিয়গুলি দায়ী আমার ভুল বিচারপ্রণালী। আমি ভাল হইলে জগৎ ভালরূপে দর্শন করিতে ভালরূপে অনুভব করিতে কোনও বাধাই দৃষ্টিগোচর হইত না। 'আপ ভালতো দুনিয়া ভাল' এটা যে একটা ধ্রুব সত্য কথা।...সর্ব্বত্র যখন ব্রহ্ম রহিয়াছেন, তখন সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন না করিতে পারিলেই বুঝিতে হইবে আমি ঠিক ভাবে দেখি নাই ঠিক ভাবে দেখিতে শিখি নাই। সর্ব্বত্র

ব্রহ্মভাব দেখিতে পাইলে সকলের ভিতর দিয়া দেবতাকে ডাকিতে শিখিলে সকলের মধ্য দিয়া অন্ততঃ আমার নিকট দেবতা ফুটিয়া বাহির হইতে বাধ্য। যাহাকে ডাকিব সে-ই তো চলিয়া আসিবে সে-ই তো প্রকট হইয়া দেখা দিবে। জগতে কিছু খারাপ আছে কিনা সাধক সে সব আগে ভাবিতে যান না। পরের ভিতরে দোষ দেখিতে পরের ভিতরে দোষ ভাবিতে যে সাধকের অধিকার নাই। তাঁর যে এখন নিজের ভিতরে দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাই তিনি নিজের দোষ দেখিতে নিজের ভিতরকার দোষগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে এত ব্যস্ত যে, পরের দোষ দেখিবার পরের ভিতরে দোষ ভাবিবার সুযোগ তাঁহার প্রায়ই জুটিয়া উঠে না। সাধনবলে ভগবৎ-কৃপায় নিজের দোষ যত দূর হইতে থাকে, ততই জগৎ-জীব তাঁহার নিকট সুন্দর বলিয়া পবিত্র বলিয়া প্রিয় বলিয়া প্রেমাস্পদের লীলাবিভূতি বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে। সুতরাং সাধক আর কি করিয়া কল্পনা করিবেন যে পরের ভিতরে জগতের ভিতরে দৃশ্যের ভিতরে দোষ রহিয়াছে? প্রকৃত সাধক যে সংসারের চোখে নিন্দিত ঘৃণিত পাপীদের ভিতরেও ভগবৎবিভূতি দর্শন করিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রাণের সেই 'শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্' রূপটিকে দর্শন করিয়া প্রেমভরে তাহাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভাবে বিভোর হইয়া যান। নিজের চিত্ত যখন একেবারে শুদ্ধ হইয়া যায় চশমার

রং যখন একেবারে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, তখন যে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন ব্রহ্মানুভূতিই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। প্রকৃত সাধক দেখিতে পান বুঝিতে পারেন হিরণ্যকশিপু কিভাবে প্রহ্লাদকে জন্মদান করেন, কিভাবে প্রহ্লাদ-চরিত্রটিকে ফুটাইয়া বাহির করেন, কি ভাবে প্রহ্লাদকে প্রকাশ করেন প্রচার করেন। তিনি যে তাই হিরণ্যকশিপুর নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি যে সীতা ও রাম-চরিত্রের প্রকাশক প্রচারক মনে করিয়া রাবণকেও ভক্তি করিতে আরম্ভ করেন। হোক না কেন হিরণ্যকশিপু রাবণ আদি সংসারের বিকৃত চোখের নিকট অসুর পাপী, সাধকের নিকট তাহারাও যে সেই একই কশ্যপের পরব্রহ্মের আত্মজ সন্তান, পরমাত্মার সগুণ ব্রহ্মের লীলার সহায়, জগতের হিতসাধনে নিযুক্ত। ব্যবহারিক জগতের কতকগুলি বিধান আছে; সেগুলি মানিয়া চলিলে বোধ হয় কাহারও আর কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।....বাঘে আর ছাগলে ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্বন্ধ। আমরা ছাগল হইলেই ছাগল থাকিলেই বাঘের বধ্য হইব, বাঘের বাচ্ছা হইলে অমৃতের সন্তান হইলে আমাদেরে মারে আমাদের অনিষ্ট করে কার সাধ্য? আমরা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইলে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকিলে তখন যে তাহারা আমাদের সেবা করিতে আমাদিগকে আদর-যত্ন করিতে আমাদিগকে ভাই বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিতে বাধ্য হইবে।

একটু চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখিলে যে আমার ভগবান ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই, সমস্তই যে আমার শ্রীভগবানের বিলাস-বিভূতি আমার পরম প্রেমাস্পদের লীলাস্বীকৃত বিগ্রহ তাঁহারই বিকাশের আশ্রয় medium of manifestation তাঁহারই লীলার সহায়। ওগো যিনি আমার সব যাঁহাকে নিয়া আমার সব, তিনিই যখন এই জগজ্জীবরূপে বিপরিণত বা বিবর্ত্তিত হইয়া এসব হইয়াছেন, তাঁহার বিকাশ লীলামাধুরী ছাড়া যখন জগতে আর কিছুই নাই, তখন বলতো তোমরা সকলে জীব মাত্রেই আমার কত আদরের ধন কত ভালবাসার পাত্র? সকলকে পরম আপনা জন মনে করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরাইতো আমার পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হওয়া উচিত। এই যে বুকে জড়াইয়া ধরি না পরম আপনা জন বলিয়া গ্রহণ করি না, এই যে আমা হইতে পর ভাবি পৃথক ভাবি, ইহাই তো আসল দ্বৈতভাব দৈত্যভাব! ইহাকেই তো বলে মায়ার বিকার।

প্রকৃত অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক যে জীবে জীবে এই ভেদ-ভাব ভেদবুদ্ধি কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার যে আপনা-পর ভেদভাব দূর হইয়া গিয়াছে, তিনি যে সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জগতের সৃষ্ট্যাদি লীলা পর্য্যন্ত অনুভবে আনিতে সক্ষম হন না, আবার তিনিই যে জাগ্রৎ-দশায় সমস্ত জগৎদেহকে নিজ দেহের সঙ্গে, সমস্ত জীবকে নিজের আত্মার সঙ্গে অভেদ মনে করিয়া অভেদভাবে অনুভব

করিয়া জীবের কল্যাণকে নিজের কল্যাণ শিবের সেবা মনে করিয়া, জীবের আনন্দকে নিজের আনন্দরূপে গ্রহণ করিয়া জীবের সেবায় আত্মসেবায় শিবের সেবায় বিভোর হইয়া যান। তাঁহার কাছে জাগ্রৎদশায় 'অতো মম জগৎ সর্ব্বং' জগতের যাহা কিছু সবই যে আমার, আর সমাধি অবস্থায় 'অথবা নচ কিঞ্চন' কিছুই আমার নহে; আমার দেহ আমার মন বলিয়াও যে তখন তিনি কিছুই অনুভব করিবার সুযোগ পান না। জগৎজীব তাঁহার নিজের স্বরূপ বা লীলা ছাড়া আর কিছুই নয়, সকলের দেহই তাঁহার নিজের দেহ সকলের প্রাণই যে তাঁহার নিজের প্রাণ সকলের সুখদুঃখই যে তাঁহার নিজের সুখ-দুঃখ সকলের আত্মাই যে তাঁহার নিজের আত্মা! এই অবস্থারই সামান্য একটু আভাস দিবার জন্যই তো একদিন একজন বৈদান্তিক সাধক গাহিয়াছিলেন :—

"আমাতে যে আমি সকলে সে আমি
আমি সে সকল সকলই আমার।
(আমি) নিরাকার নিত্য নির্ব্বিকার
আমাব আমিত্বে জগৎ প্রচার॥
(আমি) জনক রূপেতে জন্মাই সন্তান,
জননী হইয়া করি স্তন দান।
শিশুরূপে পুন করি স্তনপান
এসব নিমিত্ত কারণ আমার॥

—দেখা—

কত রূপ আমি করেছি ধারণ
কতরূপে করি ভবে আগমন।
(আমার) ভবরঙ্গ সাঙ্গ হইবে যখন
যাইব সেখানে আমি যথাকার॥

সম্ভবাসম্ভব আমাতে সম্ভব
অসম্ভব ভাব হয় জীব ভাব
আমি ভাবময় ভব নাম সদাশিব
(আমার) ভাবুক ভকত ভাবে ভাবাকার॥

নাম-রূপে আমি জগতে প্রচার
এসব অনিত্য আমি নিত্যসার।
আমার আমিত্বে উন্মত্ত সংসার
সত্য তত্ত্ব আমি আমি সত্তাকার॥

আধেয় আধার আমি মূলাধার
স্থূল-সূক্ষ্ম রূপে ব্যাপিত সংসার।
রূপ রস গন্ধ আমি অনুবন্ধ
উৎপত্তি নিবৃত্তি আমাতে সবার॥

সৃষ্টি স্থিতি লয় বারে বারে হয়
রবি শশী আদি গ্রহ সমুদয়।
কিন্তু আমি নিত্য অচ্যুত অব্যয়
"অন্তিমে তুরীয় আমি মাত্র সার"॥

ভক্তের নিকট যাহা তাহার প্রিয়তমের প্রাণারামের বিলাস-বিভূতি, জ্ঞানীর নিকট তাহাই যে পরমাত্মার পরিণাম বা বিবর্ত্তন; উভয়ই যে আবার সেই এক অখণ্ড অদ্বয়স্বরূপ পরম তত্ত্বের প্রকাশ বা বিলাস। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই উভয় দলের প্রকৃত সাধক কিছু দেখেন শোনেন ভাবেন বলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্তই যে তাঁহাদের প্রিয়তমের জাগ্রৎ অবস্থা; আবার যখন তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়েন আনন্দসমাধিতে লীন হইয়া যান, তখন যেন এসব তাঁহারই পরমাত্মায় লীন হইয়া তাঁহার পরমাত্মীয় পরমাত্মসম্বন্ধীয় আপনা হইতে সম্পূর্ণরূপে একটা অভেদ-ভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়। যিনি আমার প্রিয় যিনি আমার পরম আত্মীয় যিনি আমার প্রাণারাম, তাঁহার জাগ্রৎভাব লীলাভাবও আমার যেমন প্রিয়, তাঁহার স্বরূপভাব তাঁহার 'স্বমহিম্নি ইব স্থিতঃ' ভাবও আমার তেমনি প্রিয়; কারণ এই উভয় অবস্থাই যে তাঁহারই ভাব, এই উভয় ভাবের মধ্য দিয়া আমাদের যে তাঁহাকেই অনুভব করিতে আস্বাদ করিতে হইবে।

যে অন্যকে তুচ্ছ করিতে অবহেলা করিতে ঘৃণা করিতে পারে, অন্যের সুখদুঃখে উদাসীন থাকিয়াও আপনার সুখের অন্বেষণ করে, সেতো আর বেদান্তী নয়— সে যে একজন বেদ-ঘাতী নাস্তিক অজ্ঞান পাষণ্ড। নিজের দেহ নিজের সুখসামগ্রী নিজের যাবতীয় ভোগোপকরণ সম্বন্ধে বিশেষরূপে জাগরূক থাকিব, আর মুখে জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিব জীবের

সুখদুঃখকে অলীক বলিয়া তাহাতে উদাসীন থাকিব, ইহা যে ঘোরতর স্বার্থপরতার কাজ! ইহাই তো মানুষকে আস্তে আস্তে অজ্ঞাতসারে নরকের পথে লইয়া গিয়া পশুত্বে পরিণত করিয়া থাকে।......আমার ভগবান যেন আমাকে এইরূপ আত্মসুখী দেহাত্মবাদী অহংকারী বৈদান্তিকদের হাত হইতে রক্ষা করেন। আমার বেদ আমার বেদান্ত যেন আমাকে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের ধ্যান করিতে সর্ব্বভূতের মধ্য দিয়া আমারই পরব্রহ্মের পরমাত্মার পরম প্রেমাস্পদের সেবা করিতে সেবা দ্বারা জীবন সার্থক করিতে অধিকার দান করিয়া আমায় পরমানন্দলাভের সুযোগ প্রদান করে।

হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। তুমি যে প্রকাশিত রহিয়াছ তাহা যেন আমরা অনুভব করিয়া সর্ব্বত্র তোমার লীলাবিভূতি দর্শন করি, আমরা যেন তোমার লীলার সহায় হইতে পারি। আমরা যেন তোমার প্রকৃত বেদান্তশাস্ত্রের স্বরূপ বুঝিতে ভুল করিয়া এক-এক জন অসাধক অসংযত স্বার্থপর ভণ্ড প্রতারক বেদান্তীর কুহকে সমাচ্ছন্ন হইয়া তোমাকে ভুলিয়া তোমার বিধানকে ভুলিয়া তোমার লীলাবিভূতিকে অগ্রাহ্য করিয়া পতনের মুখে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে বিনাশের দিকে ধাবিত না হই। তোমার জ্যোতি তোমার প্রেম যেন সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা করে।

বৈদিক ঋষিদের ওঁকার-তত্ত্ব তন্ত্রশাস্ত্র তাহার আরাধ্য কালী-তত্ত্বের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কালীতত্ত্ব

ওঁকার-তত্ত্বের মধ্যে যেমন ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে অকার-উকার-মকার স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ-তত্ত্ব এবং অর্দ্ধমাত্রা তুরীয়-তত্ত্ব অবস্থিত, কালীতত্ত্বের মধ্যেও তেমনি ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-তত্ত্বরূপে কালীতত্ত্ব এবং তাহার আধার তুরীয়-তত্ত্বরূপে শিবতত্ত্ব বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। অকার-উকার-মকার তত্ত্বের ন্যায় কালী সগুণ ব্রহ্ম-তত্ত্বের বাচক, অর্দ্ধমাত্রার ন্যায় শিবতত্ত্ব আবার নির্গুণ ব্রহ্ম-তত্ত্বের কতকটা আভাস প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

সাংখ্যের প্রকৃতি ও তন্ত্রের প্রকৃতির মধ্যে মস্ত একটা পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাংখ্যের প্রকৃতি জড়া, তন্ত্রের প্রকৃতি চৈতন্যময়ী আনন্দময়ী আনন্দদায়িনী সাক্ষাৎ দেবী ভগবতী। প্রকৃতি যেমন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে নিযুক্তা প্রাকৃতিক বিধান-লঙ্ঘনকারী অসুরদের নিয়ন্ত্রী প্রাকৃতিক

বিধানানুগামী সুরদের রক্ষাকর্ত্রী, মা কালীও তেমনি অসি ও মুণ্ড দ্বারা অসুরদলনে বর ও অভয় দ্বারা সুর ভক্ত সাধকের পরিরক্ষণে আনন্দবিধানে সর্ব্বদা তৎপরা। প্রকৃতির নিয়ম ভগবৎবিধান অমান্য কর, তোমার কোথাও রক্ষার সম্ভাবনা নাই; ভগবৎবিধান পালন করিয়া চল, তোমার অনিষ্ট করে কার সাধ্য? এই রহস্য আমরা প্রকৃতির বিধান হইতে কালী-তত্ত্ব হইতে বেশ সুন্দরভাবে অবগত হইতে সক্ষম হই। ব্যষ্টি জীবদেহ সমষ্টি জগৎদেহ পরমাত্মা হইতে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইয়া পরমাত্মার উপরে অধ্যস্ত হইয়া যে ভাবে আত্মতত্ত্বকে ফুটাইয়া বাহির করিতেছে যে ভাবে ভগবৎলীলা-রহস্য জগতে বিস্তার করিয়া তুলিয়াছে, শিবহৃদয়বাসিনা শিবহৃদয়ে দণ্ডায়মানা মহামায়া শিবার ভিতর দিয়া আমরা সে তত্ত্ব আস্বাদ করিবার সুযোগ পাই। মা আমার দিগম্বরা; যিনি পূর্ণ তত্ত্বস্বরূপিণী তাঁহার বাহিরে বস্ত্রের কল্পনা করিতে যাওয়া যে অতিশয় মূর্খতার পরিচায়ক! মা যে আমার ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান তাহা রহিয়াছে মার ভিতরে। বিজ্ঞানপ্রতিপাদিত সকল রংএর অভাবাত্মক কাল রং আমার সকল বর্ণাতীত আনন্দময়ীর গায়ের রংএর একটা আভাস প্রদান করিতে চেষ্টা করে। রামপ্রসাদ বলেন মা আমার এমন কালো. যাঁহার ধ্যান করিলে সাধক-ভক্তের হৃদয় আলোতে ব্রহ্মজ্যোতিতে ভরপূর হইয়া যায়। শাস্ত্র

এ আলোর একটা আভাস দিতে গিয়া 'সূর্য্যকোটিপ্রকাশঞ্চ চন্দ্রকোটিসুশীতলং' আদি শব্দের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মার গলায় মুণ্ডমালা দেখিয়া ভয় পাইও না, ঐ মুণ্ড মাতৃভক্ত সাধকগণের পরম শত্রু অসুরগণের শাসনের জন্য। ভক্ত সাধক যখন মায়ের সাধনা আরম্ভ করেন তখন তাঁহার ভিতর হইতে কাম ক্রোধ আদি অসুরগণ কামনা বাসনা আসক্তি আদি দৈত্যগণ যখন মাথা তুলিয়া সাধনায় বিঘ্ন জন্মাইতে চেষ্টা করে, তখন মাতৃভক্ত মাতৃকোলে অবস্থিত সাধক মায়ের জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা সে সকল অসুরকে বিনাশ করিয়া পাছে আবার তাহারা সাধনরাজ্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় এজন্য সংস্কাররূপে সেই সব অসুরের মুণ্ড ব্যষ্টিভাবে নিজে সমষ্টিভাবে সমস্ত জগতে ধারণ করিয়া সাধনরাজ্যকে নিষ্কণ্টক করিয়া তোলেন। সাধক এই মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া বীর হইয়া সমস্ত জগতের উপরে মার কৃপায় একটা অব্যাহত গতি অবাধিত প্রভাব লাভ করিয়া ঐশ্বরিক ভাব বশীকার-সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন। তখন মা কি ভাবে সাধকের রক্ষাকার্য্যে আনন্দবিধানে নিযুক্ত তাহা অবগত হইয়া মাতৃভক্ত সাধক আনন্দে বিভোর হইয়া পড়েন, তখন ভয় তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে দূরে পলায়ন করে, তখনই তিনি অভয়প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কালীসাধক প্রকৃতির বিধানগুলি যাবতীয় বেদ-রহস্যগুলি অবগত হইয়া তদনুকূল-

ভাবে জীবন গঠন করিয়া প্রকৃতির কৃপায় প্রকৃতিকে জয় করিয়া পুরুষচৈতন্যের শিবতত্ত্বের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহার পরে মা আদ্যাশক্তির তালে তালে নাচিয়া পরমপুরুষের সেবার পূজার সহায় হইয়া পড়েন। সাধক একবার 'নেতি' 'নেতি'-তত্ত্বের ভিতর দিয়া পরম বৈরাগ্যের সাহায্যে 'ইতি'-তত্ত্বের কাছে গিয়া শিবতত্ত্বের নিকটে উপস্থিত হন ; তাহার পরে সেখান হইতে মা আনন্দময়ীর সহিত ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে প্রতি তত্ত্বের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট অনুস্যূত সেই ব্রহ্মতত্ত্ব আস্বাদ করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শনের ব্রহ্মধ্যানের ব্রহ্মসেবার অধিকার লাভ করেন। রাম-প্রসাদ তাঁহার অমর সঙ্গীতের মধ্য দিয়া কালীতত্ত্ব এইভাবে ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন :—

কে জানেরে কালী কেমন।
ষড়্দর্শনে যার না পায় দরশন ॥
(কালী) পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ।
(তারে) মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন ॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
(তারা) ঘটে ঘটে বিরাজ করে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছে কালীর মর্ম্ম অন্যে কেবা জানে তেমন ॥
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধুগমন।
(আমার) মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন ॥

বাস্তবিকই কালীতত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া ষড়দর্শনের লজ্জা পাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়! আমার 'তো মনে হয়, আমি ষড়দর্শনের সমস্ত গ্রন্থগুলি হইতে যে তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারি কালীমূর্ত্তি হইতে কালীতত্ত্ব হইতে তাহা অপেক্ষা যেন অনেক বেশী তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষালাভ করিতে সক্ষম। "কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ। কাল-শব্দেন বিখ্যাতশ্চাখণ্ডানন্দঃ অদ্বয়ঃ॥" যিনি নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের সৃষ্টি স্থিতি লয়-সাধন করিয়া থাকেন সেই কাল যাহাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান, সেই অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপ অদ্বয়তত্ত্বই যে কালী বলিয়া বিখ্যাত। যট্‌চক্রের প্রতি চক্রে যোগী অজপা-সাধনকালে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সকল পদ্মে সকল তত্ত্বে সেই শিব-শক্তির সেই আদি দম্পতীর মিলনরহস্য সেই ব্রহ্মতত্ত্বের লীলারহস্য আস্বাদ করিয়া থাকেন। কালী যে আত্মারাম মুনিগণের আত্ম-তত্ত্ব, প্রণবতত্ত্বও যে এই রহস্যই প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই যে সাধকের নিকটে কালীমূর্ত্তি প্রণবের ব্যাখ্যা গায়ত্রীর সাধনরহস্যের প্রকাশক। সেই মঙ্গলময়ী কিভাবে ঘটে ঘটে বিরাজিত থাকিয়া তাঁহার প্রিয়তম জীবগুলিকে কি ভাবে রক্ষা করিয়া 'তারা'নাম সার্থক করেন, তাহা সাধক ব্যতীত অন্যে আর কি করিয়া বুঝিতে সক্ষম হইবে? মা যে আমার ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, তাই মায়ায় আবদ্ধ জীব আর কি করিয়া

কালীতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে? শুধু নাকি একমাত্র মহাকালই দেবাদিদেব মহাদেবই কালীর তত্ত্ব বর্ণনা করিতে সক্ষম। রামপ্রসাদ যখন কালীমন্ত্রের সাধন-তত্ত্ব তাঁহার অমর সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তখন অবোধ লোক আর কি করিয়া তাহা বুঝিবে? তাহারা মনে করে সন্তরণে সিন্ধু-গমন বামনের পক্ষে চাঁদকে ধরিতে যাওয়া যেমন অসম্ভব, কালীতত্ত্ব সাধন করা ঠিক সেইভাবে অসম্ভব। জ্ঞানী কিন্তু এই সঙ্গীত হইতে বুঝিতে পারেন, কি ভাবে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় কালীতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করা যায়। তিনি ইড়া-পিঙ্গলার মধ্যস্থ সুষুম্নারূপা গঙ্গার ভিতর দিয়া অজপা-মন্ত্রের সাহায্যে যাতায়াত করিতে করিতে সহস্রারে সেই মহাসিন্ধুতে ভগবৎ-প্রেম-সাগরে উপস্থিত হইয়া পড়েন। পণ্ডিত জ্ঞানবলে যে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন, সাধক প্রাণ-সাহায্যে প্রাণায়াম সাহায্যে সাধনবলে সেই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া মনকে জয় করিয়া মনাতীত অমনস্ক অবস্থা লাভ করিয়া শশিরূপী জীবাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। বাস্তবিকই কালীতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাইতো সাধক বলিয়া গিয়াছেন 'নিপতিত পতি শবরূপে পায়, নিগমে যাহার নিগূঢ় না পায়'। ভগবৎ-চিৎবিভূতি বেদও নাকি এই তত্ত্ব অবধারণে অক্ষম! কালীপূজা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া সাধক ভক্ত দুঃখ

করিয়া বলিয়া গিয়াছেন "ওরে শক্তিপূজা কথার কথা নয়, যদি কথার কথা হতো চিরদিন, ভারত শক্তিপূজে শক্তিহীন হতো না। বনের মহিষ অজা মায়ের বাচ্ছা মা সে বলি লন না। যদি বলি দিতে আশ স্বার্থ কর নাশ বলিদান কর বিলাস-বাসনা। কাঙ্গাল কয় কাতরে জাত-বিচারে শক্তিপূজা হয় না। সকল বর্ণ এক হইয়ে ডাক মা বলিয়ে নইলে মায়ের দয়া হবেনা হবেনা।" বাস্তবিকই আমরা যদি শক্তিপূজা করিতে শিখিতাম তাহা হইলে আজ আমাদের এই দুরবস্থা হইত না! কোথায় আমরা আমাদের ভিতরকার কাম ক্রোধ মোহ আদি রিপুগুলিকে কামনা বাসনা সংস্কার আদি অসুরগুলিকে বিনাশ করিয়া শুদ্ধ শান্ত হইয়া মায়ের সুন্দর মন্দিরটিকে ব্যষ্টি-দেহ ও সমষ্টি-জগৎকে ভগবৎধামে পরিণত করিব, আর কোথায় আমরা মায়ের দীনহীন অবোধ সন্তানগুলিকে পাষণ্ডের ন্যায় মায়েরই সম্মুখে বলি দিয়া মাতৃমন্দিরকে একটা কসাইখানায় পরিণত করিয়া মায়ের কৃপালাভের পরিবর্ত্তে মায়ের বিদ্বেষভাজন হইয়া আপনার সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি! মা আমাদের সকলের মা, সকল জীবেরই মা; সুতরাং আমরা সকলে ভাই-বোন। এই পরম সারতত্ত্ব অবগত হইয়া কোথায় আমরা পরস্পর পরস্পরকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া জগৎময় একটা মহান ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগৎকে স্বর্গে পরিণত করিব, আর কোথায় আমরা মাকে ভুলিয়া ভাই-বোনকে না চিনিয়া ভাই-বোনের

পরম অকল্যাণ সাধন করিয়া সোণার সংসারকে শ্মশানে পরিণত করিতে বসিয়াছি! হে আনন্দময়ি, তুমি তোমার সন্তানগণকে তোমার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া প্রকৃত শক্তিপূজা শিখাইয়া দিয়া তাহাদের জীবন ধন্য করিয়া তোল।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সহিত আধিভৌতিক তত্ত্বের সম্বন্ধ লইয়া পূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে। এখন সাধকের ধ্যেয় কৃষ্ণতত্ত্বে ও ঐতিহাসিক কৃষ্ণতত্ত্বে কিরূপ সম্বন্ধ সে বিষয়ে দুইএকটী কথা লিখিতেছি। কৃষ্ ধাতু ন প্রত্যয় করিয়া কৃষ্ণ-শব্দ সাধিত—কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা, যিনি জীবকে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের মধ্য দিয়া শব্দব্রহ্মময় বেণুর সাহায্যে সর্ব্বদা নিজের কাছে ভগবৎ-আনন্দধামে আকর্ষণ করেন টানিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হন তিনিই কৃষ্ণ। কেহ কেহ বলেন কৃ-ষ-ণ হইতে কৃষ্ণশব্দ নিষ্পন্ন এবং কৃষ্ণশব্দের অর্থই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; তাই যিনি নিজের সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ সকলের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া

কৃষ্ণতত্ত্ব

বাহির করিয়া সকলকে ভগবৎভাবে ভাবিত করিয়া আনন্দসাগরে ডুবাইয়া রাখিতে ব্যাকুল তিনিই কৃষ্ণ।

আধ্যাত্মিক কৃষ্ণতত্ত্বই বিশেষভাবে সাধকদের অবলম্বনীয়। ইহা জাতিবর্ণনির্বিবশেষে সকল সম্প্রদায়ের সাধকগণেরই কল্যাণপ্রদ। ঐতিহাসিক কৃষ্ণজীবনে পুরাণকারগণ ইহার বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক কৃষ্ণতত্ত্বে কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা। রাধারাণী সে সচ্চিদানন্দের পরা প্রকৃতি, নিত্য সর্ব্বগত জীবাত্মা; ইহাকেই গীতা 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। জীব স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হইলে এই সর্ব্বগত-ভাব লাভ করে। সখীগণ সেই শ্রীরাধার কায়ব্যূহ রূপা ব্যষ্টিভূতা মনোবৃত্তিরূপে প্রতীয়মানা স্বরূপশক্তিবিশেষ। চন্দ্রাবলী কর্ত্তব্য-জ্ঞানযুক্তা 'অহং'স্মৃতি-সম্পন্না জীবাত্মা। একই সাধক পূর্ণ সিদ্ধাবস্থায় পূর্ণভাবে কৃষ্ণ-ভাবভাবিতা কৃষ্ণ-সুখৈকতৎপরা কৃষ্ণ-সেবানিরতা কৃষ্ণগত-প্রাণা হইয়া, এমন কি নিজের পৃথক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া শ্রীরাধারূপে পরিণতি লাভ করেন; আবার তিনিই যখন নিজের অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া ভগবৎপ্রীতির জন্য সংসারের সেবায় নিরত থাকেন, তখনই তিনি 'চন্দ্রাবলী'-আখ্যা প্রাপ্ত হন। সাধক যখন কতকটা স্বরূপবিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবার অধিকার-সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া স্বরূপউপলব্ধির শ্রীরাধা-ভাবপ্রাপ্তির—শ্রীরাধার কৃষ্ণসেবার সহকারী হইতে সচেষ্ট

থাকেন, তখনই তাঁহাকে সখীভাবাপন্ন সাধক বলা যাইতে পারে। ইহার নিম্নস্তরের সাধকগণ সখীর অনুগা হইয়া সখীভাব-লাভের জন্য সখীগণকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সকলেই নিষ্কাম-ভাবের সাধক, উদ্দেশ্য কৃষ্ণসুখসম্পাদন সচ্চিদানন্দভাবের স্ফুরণ সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তার অনুভূতিলাভ ; বিধিমার্গের সাধকগণ ইহার নিম্নে অবস্থিত। সাধনরাজ্যে অভিসারতত্ত্ব মনোবৃত্তি সাহায্যে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া রাধাভাব লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য কৃষ্ণসন্নিধানে অগ্রসর হইবার চেষ্টাবিশেষ। স্বরূপপ্রতিষ্ঠ না হইলে কৃষ্ণচন্দ্রকে পূর্ণভাবে আস্বাদ করা যায় না বলিয়া রাধা ছাড়া অন্যের পক্ষে অঙ্গসঙ্গসুখ মিলনানন্দউপভোগ প্রায় অসম্ভব। সখীগণ কখনও যে কৃষ্ণসঙ্গসুখলাভে সমর্থা হন, তাহাও শ্রীরাধারই কৃপার ফলে আত্মায় স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইবার স্বাভাবিক পরিণতির জন্য। সমাধিঅবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মায় পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া যে আনন্দ আস্বাদ করেন, সাধক রসোৎগার-তত্ত্বের মধ্য দিয়া ধ্যানের অবস্থায় তাহার অনুচিন্তন করিতে চেষ্টা করেন। রাসলীলা সাধকের প্রতি তত্ত্বে জগতের প্রতি তত্ত্বে রসস্বরূপ পরমাত্মার অপূর্ব্ব লীলারস আস্বাদনের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। বস্ত্রহরণ দ্বারা সাধক আপনার ত্রিবিধ-দেহের জীবাত্মা পরমাত্মার ভিতরকার বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী ও পরা আবরণ দূর করিয়া নিজের ও জগতের প্রতি তত্ত্বে কৃষ্ণসত্তা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-রহস্য

আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করেন। ইন্দ্রিয়রূপী গরুগুলি কি ভাবে সকাল-বেলা কৃষ্ণসহ অর্থাৎ পরমাত্মার সান্নিধ্যে বিষয়রূপ আহারগ্রহণে সংসারঅরণ্যে বিচরণ করে এবং সন্ধ্যাবেলা কি ভাবে কৃষ্ণসহ বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণাশ্রমে কৃষ্ণ-সান্নিধ্যে গিয়া কৃষ্ণানন্দ লাভ করিয়া কৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়, সাধক গোচারণ-লীলার মধ্য দিয়া সে তত্ত্ব আস্বাদ করিবার সুযোগ লাভ করেন। অসুরবধ-তত্ত্বের মধ্য দিয়া সাধক ভগবৎ-সান্নিধ্যে ভগবৎকৃপায় ভগবৎবিধানের মধ্য দিয়া কি ভাবে সমস্ত রিপুগুলির সমস্ত কামনা বাসনা আসক্তি অজ্ঞানতার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, সে তত্ত্ব সেই রহস্য অবগত হইয়া থাকেন। গোবৰ্দ্ধন-লীলার মধ্য দিয়া সাধক ভগবানে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া একটা পরম নিশ্চিন্ত অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হন। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর-তত্ত্বের মধ্য দিয়া সাধক তাহার সমস্ত বৃত্তিগুলির পূর্ণ পরিণতি এবং এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের দ্বারা পূর্ণরূপে আদর্শ জীবন প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। এক কথায় অতি নিম্নস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ-স্তর পর্য্যন্ত সাধনরাজ্যের যতপ্রকার সাধনবিধি সাধনরহস্য দেখিতে পাওয়া যায়, আধ্যাত্মিক কৃষ্ণতত্ত্বের ভিতরে সাধক সেই-সকলই অতি উত্তমরূপে অবগত হইবার অনুভব করিবার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় নিজের ব্যষ্টি-দেহের সমষ্টি-জগৎদেহের প্রতি তত্ত্বে ভগবৎসত্তা

ভগবৎলীলা-রহস্য অনুভব করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম-ভাবনা সর্ব্বভূতের মধ্য দিয়া ব্রহ্মসেবার অধিকার লাভ করিয়া সাধন-ভজনের সর্ব্বোচ্চ-স্তরে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া ব্রহ্মতাদাত্মভাব লাভ করিয়া থাকেন।

মহাপ্রভুর সাধনপ্রণালার মধ্যে আমরা এই আধ্যাত্মিক কৃষ্ণতত্ত্বের বেশ সুন্দর একটা আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমার বিশ্বাস সমস্ত বৈষ্ণবসাহিত্য এই আধ্যাত্মিক কৃষ্ণতত্ত্বকে বৃন্দাবনে অবতীর্ণ কৃষ্ণজীবনের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া বাহির করিয়া বীজভাবে তত্ত্বভাবে লুক্কায়িত কৃষ্ণতত্ত্বকে লোকের স্থূল দৃষ্টির প্রত্যক্ষীভূত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ-তত্ত্বই প্রধানতঃ পুরাণকারগণের অবলম্বনীয়। তাঁহারা তাত্ত্বিক কৃষ্ণলীলাকে নিত্য কৃষ্ণলীলাকে এই ঐতিহাসিক নৈমিত্তিক কৃষ্ণজীবনের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া বাহির করিতে নিরত। যে লেখক যত পূর্ণতাপ্রাপ্ত তাহার বর্ণনায় আমরা আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক, তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের ভিতরে তত বেশী সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। অসিদ্ধ লেখকদের বর্ণনার ভিতরকার অসামঞ্জস্যই আজ আমাদের জীবনগত ও কার্য্যগত এক অপূর্ণভাবের সৃষ্টি করিয়া শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পূর্ণ পবিত্র কৃষ্ণচরিত্রকে এতটা বিকৃতভাবে ধারণা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে। ঐতিহাসিক পূর্ণ আদর্শ কৃষ্ণজীবনে তাই আজ অনেকে অপূর্ণভাবের নানারূপ বিকৃতভাবের সম্ভাব

দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকৃত সাধকদের নিকট ঐতিহাসিক কৃষ্ণজীবনও পূর্ণ আদর্শরূপে প্রকটিত; তাঁহাদের তাত্ত্বিক কৃষ্ণ যেন এই আদর্শজীবন দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়া ভগবানের নিত্য কৃষ্ণলীলার একটা সুন্দর পরিচয় সকলের নিকট প্রদান করিয়া মর্ত্ত্যবাসীকে ভগবৎধামে আকর্ষণ করিয়া ভগবৎ-লীলা-তত্ত্ব উপলব্ধি করাইয়া ব্রহ্মানন্দে বিভোর করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। ঐতিহাসিক কৃষ্ণচন্দ্র যেন মর্ত্ত্যধামে আসিয়া নিত্যধামের সেই নিত্যলীলার অভিনয় করিয়া জীবকে নিত্য-ধামের উপযুক্ত করিয়া মর্ত্ত্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হিন্দুরা ভুলিয়া গিয়াছেন প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম কি, মুসলমানেরা ভুলিয়া গিয়াছেন মুসলমান কাহাকে বলে, খ্রীষ্টিয়ান ভুলিয়াছেন যীশুকে ভক্তি করার প্রকৃত অর্থ কি, বৌদ্ধেরা ভুলিয়া গিয়াছেন বৌদ্ধধর্ম্মের মৈত্রীভাব ব্রহ্ম-বিহার কি ভাবে সাধন করিতে হয়; তাইতো ইহাঁদের মধ্যে এতটা মনোমালিন্য ঝগড়াবিবাদ যুদ্ধবিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া ধর্ম্ম হারাইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঠিক ভাবে দেখিতে পড়িতে বুঝিতে বুঝাইতে না জানিয়াই তো আজ আমাদের এই দুর্গতি, জগতে এই অশান্তি।

সাম্প্রদায়িকতা

অধুনা সকল সম্প্রদায়ই সারতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া অসার লইয়া ব্যস্ত, তাই ধর্ম্মের ভিতরকার আসল জিনিসটি না বুঝিয়া কতকগুলি বাহিক আচার-ব্যবহারকেই ধর্ম্ম মনে করিয়া ধর্ম্মের একটা বাহ্য আবরণে সীমাবদ্ধ হইয়া সীমাবদ্ধ থাকিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে তাহারা এতটা অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। নৈমিত্তিক ভাব বা কাজগুলি গৃহীত হয় নিত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য

বুঝাইবার জন্য উপলব্ধি করিবার জন্য। সেই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-গুলি যখন নিত্যকে প্রকাশ না করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে ঢাকিয়া ফেলিতে বিকৃতভাবে প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তখন সেই আগন্তুক নৈমিত্তিক ধর্ম্মগুলিকে সরাইয়া দিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করাই যথার্থ ভগবৎভক্তের কাজ। আমাদের বিশ্বাস ধর্ম্মকে ছাড়িয়া কিছুই কোন অনুষ্ঠানই দাঁড়াইতে পারে না। শিবের বুকে না দাঁড়াইলে শিবের সাহায্য শিবের আশ্রয় শিবের অনুমোদন না পাইলে শিবার তাণ্ডবলীলা জগতের ধ্বংসের কারণ হইয়া পড়িত। এই যে অজকালকার আন্দোলনবিশেষে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান আদি সকল সম্প্রদায়ের লোকই দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ সাম্প্রদায়িক বিবাদবিসম্বাদ একটুও কমিতে দেখা যায় না; ইহার মূল কারণ এই যে ওখানে যাঁহারা মিলিত হন, তাঁহাদের মধ্যে খাঁটি ধার্ম্মিকের ভগবৎভক্তের সদ্ভাব বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বার্থপর অধার্ম্মিকদের মিলনের মধ্যে প্রকৃত সমন্বয় প্রকৃত সদ্ভাব প্রকৃত শান্তির সম্ভাবনা দেখিতে চাওয়া যে দূরাশা! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে দিন খাঁটি কয়েকজন হিন্দু খাঁটি কয়েকজন মুসলমানকে ভাই বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিতে পারিবে, সে দিন তাহাদের প্রভাবে তাহাদের ধর্ম্মবলে সাম্প্রদায়িক সব অশান্তি দূর হইয়া যাইতে বাধ্য হইবে। হিন্দুকে মুসলমান করিয়া বা মুসলমানকে হিন্দু করিতে গিয়া

উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবের আশা করা যে কেবল দুরাশা মাত্র, তাহা এখন পর্য্যন্তও আমরা বুঝিতে সক্ষম হই নাই। মুসলমানেরা যদি মুসলমান-ধর্ম্মকে ঠিক ভাবে বুঝিয়া আদর্শ মুসলমান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, হিন্দুগণ যদি হিন্দু-ধর্ম্মকে ঠিকভাবে বুঝিয়া আদর্শ হিন্দু হইতে চেষ্টা করেন, তবে উভয়ের ভিতরকার সব ভেদভাব স্বাভাবিক নিয়মে দূর হইয়া পরস্পরের মধ্যে একটা সদ্ভাব মৈত্রাভাব একতার ভাব আসাই যে তখন স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে।

'ভেদভাব থাকে ডাল পালার কাছে ফল-ফুলের কাছে, কিন্তু গোড়ায় যে একটা অখণ্ড ভাব ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সকল ধর্ম্মমতেই মূলে যখন রহিয়াছেন এক, বস্তুত যখন তাঁহারই বিকাশ তাঁহাকেই প্রকাশ করে, তখন কোনও মতে যে একবার সেই গোড়ার কাছে মূল কারণের কাছে সেই অখণ্ড অদ্বয়-তত্ত্বের নিকটে গিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছে, তাহার ভিতরে আর যে কিছুতেই কোনও ভেদভাব দেখিতে পাওয়া যায় না; বাহ্যিক একটা গণ্ডিবদ্ধ ভাব আর তাহার ভিতরকার অসীম ভাবকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হয় না। যত ভেদভাব যত বাদবিসম্বাদ যত ঝগড়াবিবাদ, তাহা যে শুধু বাহিরের একটা খোসা লইয়া; যাঁহারা কোনও মতে একবার ভিতরে গিয়া ভগবানের ভগবৎধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরে কোন ভেদভাব কল্পনা করাও

যে তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। যেখানে বাদ-বিবাদ ঝগড়া-কলহ সেখানেই বুঝিতে হইবে যে তথাকার কেহই ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা কেবল দূরে বসিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝিয়া অসার তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছেন মাত্র; সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির ভাব মনোমালিন্য অশান্তি দূর করিতে হইলে আমাদিগকে আদর্শ ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিতে সমস্ত ধর্ম্মের মূল স্বরূপ যে ভগবৎবিধান ভগবৎ-তত্ত্ব তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। হিন্দুদিগকে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম বুঝিয়া লইয়া আদর্শ হিন্দুজীবন লাভ করিতে হইবে। মুসলমান ভাইদের প্রকৃত মুসলমানধর্ম্ম বুঝিয়া লইয়া আদর্শ মুসলমান বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। যীশুর ও বুদ্ধের উপাসকগণকে যীশু ও বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম্ম অবগত হইয়া আদর্শ খ্রীষ্টিয়ান ও বৌদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে। যেখানে আদর্শ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান একত্র হইবে, সেখানে যে একটা ভ্রাতৃভাব একতার ভাব প্রেমভাব কিছুতেই না আসিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে শান্তি দেখিতে শান্তি স্থাপন করিতে ইচ্ছা থাকিলে, মুসলমানদেরে আদর্শ মুসলমান হইতে হিন্দুদেরে আদর্শ সিদ্ধ জীবন লাভ করিতে খ্রীষ্টিয়ানদেরে আদর্শ যীশু-ভক্ত হইতে যথাসম্ভব যথাশক্তি সাহায্য করিতে আরম্ভ কর। বুঝিতে চেষ্টা কর যিনি ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য রাম কৃষ্ণ

ও শিবকে পাঠাইয়াছেন, তিনিই বুদ্ধ যীশু ও মহম্মদকেও পাঠাইয়াছেন। ইহাঁদের ভিতরে কোনও ভেদভাব নাই, ইহাঁরা স্বরূপতঃ একেরই আদেশে একেরই ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। শোনা যায় শিব ও রামের পরস্পর দেখা হইলে তাঁহারা পরস্পার পরস্পরকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিতে বুকে জড়াইয়া ধরিতে বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, কিন্তু শিবভক্ত ও রামভক্ত ভূত-প্রেত ও বানরদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত। আমরা যতই শিব-রাম-যীশু-মহম্মদের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিব, ততই যে আমাদের ভিতরকার ভেদভাবগুলি দূর হইয়া পরস্পরের ভিতরে একটা সদ্ভাব স্বাভাবিক বিধানে স্থাপিত হইতে বসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যত কিছু গোলমাল সে কেবল প্রেমের অভাবে। ভিতরে প্রেম থাকিলে প্রেমময়ের দিকে দৃষ্টি থাকিলে পরস্পরের ভিতরে একটা প্রেমভাবের আবির্ভাবই যে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি ভগবানে আল্লায় সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পূর্ণভাবে ভগবানে আত্ম-নিবেদন করিয়া একেবারে তাঁহার হইয়া গিয়াছে, সে-ই যে প্রকৃতপক্ষে আদর্শ মুসলমান বা ইসলামী।

কোরাণে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সকল এসলামবাদীর ভিতরে একটা অতি উচ্চাঙ্গের ভ্রাতৃভাবের। মানুষে মানুষে যাহাতে কোনও ভেদভাব না আসিতে পারে, ভেদভাব

না থাকিতে পারে, কোরাণ সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। কোরাণ সমস্ত প্রাচীন মহাত্মাদিগকে তাঁহাদের উক্তিগুলিকে বিশেষভাবে ভক্তি করিতে সম্মান করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। বিনয় কৃতজ্ঞতা পরোপকার ও ক্ষমাকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কোরাণ মুক্তকণ্ঠে অতি গর্ব্বের সহিত ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদের হাসান-হোসেনের প্রাচীন প্রচারকগণের জীবনকাহিনা ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান মুসলমানগণ যদি কোরাণকে ঠিক ভাবে দেখিতে পড়িতে বুঝিতে বুঝাইতে ও প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় জগতে কোরাণের মহিমা বিশেষভাবে রক্ষিত বর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিবে। সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। প্রাচান হিন্দুধর্ম্মের সারকথা ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব, তাঁহাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করা ধ্যান করা সর্ব্বভূতের মধ্য দিয়া তাঁহার সেবা করাই যে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান সাধনা। যিনি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, এমন কি আমার আত্মা হইতেও সমধিক প্রিয়, সেই আমার পরম প্রেমাস্পদই জগৎরূপে জীবরূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হইয়া এইভাবে আপন লালারস লীলা-মাধুরা বিস্তার করিতে বসিয়াছেন। জীব মাত্রই যে আমার নিকট পোষাকপরা শিব, আমার শ্রীভগবানের জীয়ন্ত বিগ্রহ আমার সর্ব্বাপেক্ষা আদরের ভালবাসার সেবার সামগ্রী! যেখানে কোনও বিভূতিমৎ সত্ত্ব দৃষ্টিগোচর হইবে, হিন্দুগণ

যে সেখানেই তাহাকে শ্রীভগবানের অবতার-রূপে গ্রহণ করিয়া সম্মান করিতে ভক্তি করিতে, পূজা করিতে আরম্ভ করিবেন। হায়, হিন্দুধর্ম্মের এমন উন্নত আদর্শ আজ কোথায়? আজ পর্য্যন্তও এই উদার হিন্দুধর্ম্ম মহম্মদকে তাহার একজন অবতাররূপে গ্রহণ করিয়া মুসলমান-ভাইকে ভাই বলিয়া কি সেই ভাবে বুকে জড়াইয়া ধরিতে সক্ষম হইয়াছেন? যীশুর সারধর্ম্ম তাঁহার স্বর্গস্থ পিতাকে পিতা বলিয়া বুঝিয়া লইয়া জীব মাত্রকেই ভাই বলিয়া বুকের কাছে টানিয়া লওয়া, বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরা। কি সুন্দর একটা প্রেমের ভাব সেবার ভাব স্বার্থত্যাগের ভাব বিনয়ের ভাব আত্ম-নিবেদনের ভাব আমরা ভগবান যীশুর জীবনে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি। ভগবান বুদ্ধের সংযম শূন্যবাদ কামনা বাসনা আসক্তিকে দূর করার ভাব সর্ব্বজীবে আত্মবৎ একটা মৈত্রী ভাব কি সুন্দর ভাবে ধর্ম্মের এক উচ্চ আদর্শ আমাদের চোখের সম্মুখে লইয়া আসে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমস্ত সাম্প্রদায়িক ঝগড়া-বিবাদ দূর করিতে হইলে আমাদিগকে সাধনা করিতে হইবে, আপন আপন শাস্ত্রের সারতত্ত্ব বুঝিয়া লইয়া তদনুসারে জীবন গঠন করিয়া আমাদের কথা ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া আমাদের ধর্ম্মভাবগুলিকে জীয়ন্ত করিয়া তুলিয়া সমস্ত ধর্ম্মের মূলে যে ভগবৎতত্ত্ব অদ্বৈত সারতত্ত্ব রহিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া লইতে হইবে। অভেদের দেশে না গেলে

অভেদের ভাবে ভাবিত না হইলে সমস্ত ভেদ দূর করা যে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। আমাদের দৃষ্টি যে একেবারে বহির্মুখে জড়ের দিকে নাস্তিকতার দিকে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। ভিতরের দিকে মূল কারণের দিকে আত্মার দিকে পরমাত্মার দিকে আমরা যে একবারও চাহিয়া দেখিবার সুযোগ পাইনা। এমন কি, না দেখিয়া না বুঝিয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিয়াই আমরা যে সে দিকটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে অবিশ্বাস করিতে উদ্যত হইয়া পড়িয়াছি। ভিতরের কথা ধর্ম্মের কথা আত্মার কথা ভগবানের কথা আমরা যাহা কিছু শুনি বলি প্রচার করি, তাহা যে কতকগুলি পাখীর মত মুখস্থ করা গদ ছাড়া আর কিছুই নহে! ঐসব বিষয়ে আমাদের অনুভূতি কোথায়? ঐসব সূক্ষ্ম ভাব বেদ্য তত্ত্বগুলি কি উপযুক্ত সাধনা ছাড়া দুই-একখানা বই পড়িয়া কিছু বুঝিতে পারা যায়? আমরা কথায় আস্তিক পণ্ডিত হইলেও ভাবে ও কাজে যে একান্তভাবে নাস্তিক ও মূর্খ হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপযুক্ত সাধনার অভাবে আমরা যে শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য একটুও অনুভব করিতে সক্ষম নহি। আমাদের দৃষ্টির দোষে বুদ্ধির দোষে সংস্কারের মলিনতার প্রভাবে আমরা যে এসব সার পদার্থকে অমূল্য রত্নরাজিকে কলুষিত করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছি।

হে ভগবান! আমরা বুঝি আর না বুঝি আমরা তো তোমারই সন্তান, তুমি তো আমাদিগকে ভুলিয়া যাইতে ত্যাগ করিতে সমর্থ নও। আমরা না হইলে যে তোমার চলে না! তুমি তো আবিঃ তুমি তো স্বয়ংপ্রকাশ, প্রকাশ পাওয়া প্রকাশিত হওয়া সব পদার্থকে প্রকাশ করাই যে তোমার স্বভাব বা ধর্ম্ম। অসত্য কতক্ষণ সত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে? তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও, তুমি যে প্রকাশিত আছ তাহা আমাদিগকে বুঝিতে দাও। তুমি কৃপা করিয়া দিব্যদৃষ্টি দান না করিলে যে কেহই তোমাকে দেখিতে পায় না। আমরা যাহাতে তোমাকে তোমার বিধানকে তোমার শাস্ত্রকে তোমার ভক্তদিগকে তোমার এই প্রপঞ্চ-রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে অবগত হইয়া তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া আমাদের জীবন সার্থক করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এমন শক্তি প্রদান কর। এই অসার জড়তা স্বার্থপরতা মলিনতার দিক হইতে আমাদের দৃষ্টি তোমার জ্যোতির্ম্ময় প্রেমময় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ স্বরূপের দিকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া তোমার অপার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও লাবণ্যের সাগরে আমাদিগকে ডুবাইয়া রাখ। আমাদের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান ভাই-সকল যেন তাহাদের আপন আপন ধর্ম্মের সার-তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের সার-তত্ত্ব হৃদঙ্গম করিয়া আদর্শ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া পৃথিবী হইতে

যাবতীয় দ্বন্দ্বভাবের ঝগড়াবিবাদের মনোমালিন্যের সমস্ত কারণ-গুলিকে দূর করিয়া এই মর্ত্ত্যধামে তোমার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র একটি মহান প্রেমের গৌরব ভগবৎভাবের সত্তা উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিয়া জগৎকে মধুময় করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়। হে আমাদের চক্ষুর চক্ষু, তুমি আমাদিগকে দয়া করিয়া দিব্য-দর্শন দান কর; আমরা যেন তোমাকে তোমার বিধানকে তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকে ঠিকভাবে দর্শন ও উপলব্ধি করিয়া তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে, তোমাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিয়া আমাদের জীবন সার্থক করিতে, তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করিতে সক্ষম হই।

হরিদ্বার—জুন, ১৯০২

* * *

······অনেকে জিজ্ঞাসা করেন ভগবানকে দেখা যায় কি না? আচ্ছা বলতো কি উত্তর দিব? এইখানে দুইটী বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। প্রথম 'ভগবান কি', দ্বিতীয় 'দেখা কিরূপ ব্যাপার ও কত রকমের'। ভগবানের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবের দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে,—নির্গুণ-ভাব ব্রহ্মভাব অব্যক্ত-ভাব দেখিবার জিনিস নয়। উহা পাওয়া যায় না, হওয়া যায় বলিয়া শুনিতে পা'ই। দ্রষ্টা কখনও দৃশ্য হইতে পারে না; সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দেখা-শোনার কথা না বলিলেই ভাল হয়। ভগবানের সগুণ-ভাব বিশ্বরূপ-ভাব সাধনা দ্বারা ভগবৎকৃপায় দৃষ্টিগোচর হয়—তাহাও দিব্য চক্ষু দ্বারা; গীতার 'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ' স্মরণ কর। প্রত্যেক বস্তু উপলব্ধির জন্য নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রিয় দেওয়া হইয়াছে, যেমন রূপের জন্য চোখ শব্দের জন্য কান ইত্যাদি। কিন্তু ভগবৎদর্শনের জন্য অলৌকিক ইন্দ্রিয়ের কথাও শুনা যায়—যেমন 'সচক্ষুঃ অচক্ষুরিব' ইত্যাদি। সাধনা দ্বারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলির যে শক্তি বৃদ্ধি পায় "দূর-দর্শন-ঘ্রাণ-স্বাদ-বার্ত্তা জায়ন্তে" ইত্যাদি সূত্র তাহার সাক্ষী। মনের সব ময়লা দূর

ভগবৎদর্শন

হইয়া গেলে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃতভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। সাধকেরা সাধনা দ্বারা জীবদেহকে দেবদেহে পরিণত করিতে পারেন। সাধারণ মানুষ দেখে অসংযত বিকারগ্রস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা, চিন্তা করে অনুভব করিতে চেষ্টা করে কামনা বাসনা সংস্কার-রঞ্জিত মন দ্বারা; সুতরাং তাহাদের দেখা-শোনাটা যে ঠিকভাবে দেখাশোনা নয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি! সাধক ও অসাধকের দর্শন শ্রবণ ও অনুভূতির মধ্যে অনেকটা পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধ-মহাত্মাদের দর্শন তো সম্পূর্ণরূপে অন্য রকমের ব্যাপার। শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদেবের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া যাইতেন। মা যে ভাবে তার ছেলেকে দেখে, স্ত্রী যে ভাবে তার স্বামীকে দেখে, সাধারণে বোধ হয় সে ভাবে দেখিতে পায় না। মজনুর চোখে লয়লা পরমাসুন্দরী—মজনুর চোখ না পেলে অন্যে সে সৌন্দর্য্য দেখিতে আস্বাদ করিতে পারিবে না; সুতরাং পরস্পরের দেখার মধ্যেও যে অনেকটা পার্থক্য থাকিয়া যায়।

স্থূলরূপে দেখা যায় স্থূল চোখে, সূক্ষ্মরূপ দেখিতে হইলে কারণরূপ দেখিতে হইলে অন্য চোখের দরকার; স্থূলচক্ষু সেখানে ততটা কাজ দিতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভক্ত ভগবানকে যতটা জানেন, আর কোন জিনিসকেই তিনি ততটা জানিতে পারেন না; তাঁহাকে যতটা দেখেন শুনেন আস্বাদ করেন, ততটা অন্য কোনও জিনিসকে যেন আস্বাদ করা একান্ত

অসম্ভব। সকলের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার ভগবানকে যতটা দেখিতে শুনিতে পান, ততটা যেন অন্য কিছু দেখিতে শুনিতে পাইতে পারেন না। মনে কর আমার সম্মুখে একদিকে একটা পুকুর, অন্য দিকে সমুদ্র। এখন সমুদ্রের মধ্য দিয়া আমার দৃষ্টি-শক্তি বিচারশক্তি যতদূর যেতে পারে পুকুরের মধ্য দিয়া কিছুতেই ততটা যেতে পারে না—কতকটা গিয়াই যেন বাধা পায় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। অনন্তের মধ্য দিয়া যেন একটু বেশী দূর যাবার সুযোগ পাওয়া যায়। মানুষকে মানুষভাবে দেখিবার ও ভাবিবার সময় আমরা তাহার ভিতর দিয়া যত দূর যেতে পারি, মানুষকে ভগবৎবিগ্রহভাবে ভাবিয়া তাহার ভিতর দিয়া ভগবানকে দেখিতে ভাবিতে ও আস্বাদ করিতে গিয়া আমরা যেন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দূর চলে যেতে পারি! এইভাবে দেখিতে শিখিলে আমরা বোধ হয় মানুষকেও অনেকখানি বেশী দেখিতে অনেকটা বেশী ভাবে পাইতে পারি। 'যত্র যত্র মনো-যাতি ব্রহ্মণস্তত্রদর্শনম্' এইভাবে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া চলিলে যেন অনেকটা বেশী দূরে যাওয়া যায়, অনেকটা বেশী করিয়া পাওয়া যায়। সাধক যতটা পান যতটা ভোগ করেন, অসাধকের পক্ষে ততটা পাওয়া বা ভোগ করা অসম্ভব। সাধকদের দৃষ্টি ও অনুভূতি বেশী দূর যেতে পায় বলিয়া তাঁহারা সব জিনিস বেশী করিয়া দেখেন বেশী করিয়া পান বেশী করিয়া ভোগ করেন। ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলে সাধারণ লোকেও সাধক-

দেরে যতটা পায় ভোগ করে, অপরকে ততটা পাইতে বা ভোগ করিতে পারে না ; এজন্য সাধকদের প্রতি অনেকে একটু বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ইহা ছাড়া সাধকদের চিত্ত স্বচ্ছ বলিয়া তাঁহাদের ভিতর দিয়া আত্মদর্শন পরমাত্মদর্শন সহজ হইয়া পড়ে বলিয়া তাঁহাদেরে একটু বেশী করিয়া দেখিবার ও পাইবার সুবিধা হয়। তাহা ছাড়া সাধকদের ভাবগুলি স্রোতগুলি আত্মার পরমাত্মার ভাবের অনুকূল বলিয়া তাঁহাদের ভিতর দিয়া আত্মাকে পরমাত্মাকে আনন্দস্বরূপকে রসস্বরূপকে বেশী করিয়া পাওয়ার ফলে লোকে একটু বেশী তৃপ্তি পায়, একটু বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। পরমাত্মার আকর্ষণ-শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়াই তো তিনি কৃষ্ণ ; সুতরাং যাঁহারা তাঁহাকে যত পাইয়াছেন, যাঁহাদের ভিতর দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র যত বেশী ফুটিয়া বাহির হইবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদের আকর্ষণ-শক্তিও তত প্রবল হওয়াই যে স্বাভাবিক ! ফলে ভাললোকেরা তাঁহাদের প্রতি বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। মলিনচিত্ত-বিশেষেরা ভগবৎআকর্ষণ তত বেশী উপলব্ধি করিতে পারে না। মালিন্যযুক্ত লৌহ চুম্বক দ্বারা তত সহজে আকৃষ্ট হয় না। লৌহ যেখানে বিশুদ্ধ আকর্ষণ সেখানে গভীর।

ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন নিজেকে ধরা দিবার জন্য। তিনি ধরা দিবার জন্য যখন ব্যস্ত তখন তাঁহাকে ধরিতে গেলে শুধু আমার নিজের শক্তির উপর

নির্ভর করিতে হইবে না, তাঁহার শক্তি তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার প্রেমও একাজে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সহায় হইবে। তিনি ধরা দিতে ব্যস্ত, সুতরাং আমাদের তাঁহাকে ধরা কত সহজ! তিনি ভুবনমোহনরূপে সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সুতরাং তাঁহাকে না দেখাই যে আশ্চর্য্যের কথা! তিনি নিজেকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, তাঁর ইচ্ছায় কে বাধা দিবে? জীবের স্বরূপই যে ভগবানকে পাওয়া তাঁহার লীলার সহায় হওয়া। আমরা যে তাঁহাকে দেখি না পাই না, সেটা কেবল আমাদের বিকারের জন্য অজ্ঞানের ফলে। তাঁহার প্রেম মা-বাপ ভাই-বোন স্বামী-স্ত্রী ও বন্ধুদের মধ্য দিয়া কি ভাবে আমাদের নিকট আসিয়া তাঁহার আহ্বান প্রকাশ করে, সেদিকে দৃষ্টি থাকিলে তাঁহাকে ধরা ও পাওয়া যে সহজ হইয়া পড়ে। তিনি লুকোচুরি-খেলা ভালবাসেন তাই লুকান, কিন্তু তার মধ্যে যে তাঁর টু' দিবার বিরাম নাই! ঐ টু-শব্দ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে খুঁজিলেই পাওয়া যায়। যে চোর ধরা দিবার জন্য ব্যস্ত তাহাকে ধরা যে খুবই সহজ। তার পরে একটু ভাবিয়া দেখ তো, এই যে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের অজস্র স্রোত আমাদের কাছে আসিয়া আমাদেরে বিভোর করিয়া দিতেছে—ইহারা কে? কার রূপ কার শব্দ কার স্পর্শ কার গন্ধ ইহারা বহন করিয়া আনিতেছে? একটু ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা কর, এসমস্তের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবার সুবিধা পাইবে। ইহারা বন্ধনের কারণ ভাবিয়া একটা

ভুল বিশ্বাস দ্বারা চালিত হইয়া ইহাদেরে বন্ধনের কারণ করিয়া নিজেকে বদ্ধ বলিয়া আমরা একটা মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছি!

প্রিয়তমের অনুসন্ধানে বনে গিয়া তাঁহার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে একটু সমাধির মত ভাব এসেছে, আর অমনি তিনি এসে অতি প্রেমের সহিত গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে আরম্ভ করেছেন; তখন যদি আমরা তাঁর দিকে না চেয়ে তাঁকে না দেখে তাঁর কথা না শুনে 'ওগো, ছেড়ে দাও আর বাঁধিও না—মলাম মলাম' বলে কেঁদে সেখান হতে পালাতে চেষ্টা করি, তবে সেটা আমাদের কি দুরবস্থা বলতো? 'বন্ধন' কথাটা খুব শুনেছ—খুব মুখস্থ করে রেখেছ। ভগবান বালগোপাল-বেশে এসে গলা জড়াইয়া ধরিলেন, আর তুমি 'বন্ধন বন্ধন' বলিয়া পালাইতে চেষ্টা করিলে, রাধা-রাণী স্ত্রীরূপে আসিয়া আদর করিতে বসিলেন আর তুমি তাহাকে নরকের দ্বার মনে করিয়া ছুটিয়া পলাইলে, বিশ্বনাথ বাপের ভিতর দিয়া অন্নপূর্ণা মার ভিতর দিয়া আসিয়া কোলে করিয়া বসিলেন আর তুমি ভয়ে অধীর হইয়া পড়িলে! বলতো এ বুদ্ধি নিয়া কি ভগবৎদর্শন করা সম্ভব হয়? আরে পাগল! তাঁর হাতের বন্ধনই যে মুক্তি, চোখ খুলে মুখস্থ শাস্ত্রের গদগুলি ভুলে গিয়ে অভ্যস্ত সংস্কারের মুখোসটা ফেলে দিয়ে একবার চেয়ে দেখ্—তোর সম্মুখে দাঁড়ায়ে ও কে! তুই দেখ্‌বি না, সে দোষটাও চাপাবি তাঁর ঘাড়ে? আর বলে বসচিস্ তাঁহাকে

পাওয়া অসম্ভব! তোর কাশী যাওয়া মক্কা যাওয়া সহজ হ'ল, আর একটু চোখ খুলে চেয়ে দেখাটাই হ'ল কঠিন!

সর্ব্বব্যাপীকে স্থানবিশেষে মন্দিরবিশেষে মূর্ত্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ করে কেবল হায় হায় করবে আর কি করে যাব কি করে পাব ব'লে চীৎকার করে মরবে, এটাও কি তাঁর দোষ? তিনি সর্ব্বগ,—সর্ব্বত্র তাঁহাকে অনুভব না করিতে পার তো বিভূতিমৎ পদার্থে অনুভব করিতে চেষ্টা কর। 'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ' শ্রুতিটি স্মরণ কর। "স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে মধুব্রতানাং মকরন্দপানে। দানে দয়ালোরথ ভক্তগানে পশ্যামি মূর্ত্তিং করুণাময়ি তে॥" শ্লোকটা লইয়া সাধন কর। "বনস্পতৌ ভূভৃতি নির্ঝরে বা কূলে সমুদ্রস্য সরিৎতটে বা। যত্রৈব চিত্তে সমুদেতি ভক্তিস্তত্রৈব পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্॥" এ শ্লোকগুলি শুধু পাখীর মত মুখস্থ করিয়া রাখিলে কি লাভ? এ সব লইয়া সাধন করিতে হয়, এ সব মন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া এ সব বিভূতির ভিতর দিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিতে হয়। শুধু পঠন-পাঠন মুখস্থ-করণের কাজ নয়—সাধন করে দেখে নিতে হবে; দর্শন-শাস্ত্রকে শুধু শ্রবণ ও কথনে সীমাবদ্ধ না করিয়া দর্শন করিয়া লইতে হইবে অনুভব করিতে হইবে। ভগবানের অস্তিত্বটা শুধু কথায় বিশ্বাস করিয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। কথায় আস্তিক, ভাবে চিন্তায় ব্যবহারে কাজে নাস্তিক হইলে

ভগবৎদর্শন যে একেবারেই অসম্ভব। চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাওয়া যায়, তবে সেটা বিধানমতে—শুধু চুপ করে বসে পাখীর মত না বুঝে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে নয়।

আমার কিন্তু ধ্রুব বিশ্বাস ভগবানকে সুখী করা সহজ, মানুষকে সুখী করা কঠিন; ভগবানকে পাওয়া সহজ, মানুষকে পাওয়া কঠিন। লক্ষ্যটা তাঁর দিকে থাকিলে কেহ আমাদেরে ভুলাইতে পারে না বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, আমাদের কর্ত্তব্য-সাধনে বাধা দিতে পারে না। সর্ব্বভূতের মধ্য দিয়া তাঁহাকে না দেখিলে তাঁহাকে না পাইলে আমাদের যে চলিবে না। জগতের মধ্য দিয়া জগন্নাথকে দেখিতে হইবে পাইতে হইবে ফুটাইয়া বাহির করিতে হইবে। তিনি আমাদেরে পেতে ব্যস্ত, আমাদের নিকট ধরা দিতে ব্যস্ত, আমাদেরে তাঁহার মনের মতন করিয়া নিতে ব্যস্ত; এ অবস্থায় আমরা তাঁহাকে পেতে পারি না, এ কথা মনে করা যে একটা ঘোর নাস্তিকতা! আমি এতটা নাস্তিক হইতে যে সাহস করিতে পারি না। আমার সুখ শান্তি কল্যাণের জন্য আমার ভগবান ব্যস্ত। আমি না হলে তাঁহার চলে না; বলতো আমার মত ভাগ্যবান জগতে আর কয় জন আছে? আমি কিন্তু পরম আনন্দে আছি। নিরানন্দে থাকিবে মা-মরা ছেলেরা, নিরানন্দে থাকিবে নাস্তিকেরা। আস্তিকদের যে সর্ব্বত্র মধু মধু মধু—আনন্দই আনন্দ। কাশী, ১৯০৪

ভগবান সর্ব্বব্যাপী। তিনি সৎস্বরূপ চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ। তিনি সর্ব্বভূতের মধ্য দিয়া সকল জীবের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে, নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। যিনি স্বয়ম্প্রকাশ, তিনি কি নিজেকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন? সুতরাং সমস্ত বিশ্ব সমস্ত জীবদেহই তাঁহার মূর্ত্তিপ্রকাশের আধার—'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তাই জান না?' রামপ্রসাদের গানটা স্মরণ করিও।...সব জিনিসের মধ্য দিয়া তাঁহাকে আস্বাদ করিতে হইবে, তাঁহাকে ফুটাইয়া বাহির করিতে হইবে। তাঁহাকে খুঁজিলেই তিনি ধরা দেন, কারণ ধরা দেওয়াই যে তাঁহার প্রাণের আশা—এই ধরা দেওয়ার রহস্য নিয়া হিন্দুদের অবতার-তত্ত্ব। তিনি ফুটিয়া বাহির হইতে ব্যস্ত—তবে তাঁর এই ফুটিয়া বাহির হওয়াতে বাধা দেয় কে? বাধা দেয় জীবের অজ্ঞানতা, বাধা দেয় জীবের কামনা বাসনা আসক্তি, বাধা দেয় জীবের সংস্কার। এই সব ময়লা দূর করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ শান্ত করিবার জন্যই তো হিন্দুদের যত সাধন-ভজন ব্রহ্মচর্য্য-পালন যম-নিয়মাদির অভ্যাস নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ব্রত পূজা সন্ধ্যা আদি—সবই এই চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করিবার জন্য। যাহার চিত্ত যত শুদ্ধ ও শান্ত

হইবে, তাহার ভিতর দিয়া তিনি তত ফুটিয়া বাহির হইবেন ; সর্ব্বভূতের ভিতর দিয়া সকল জীবের মধ্য দিয়া তিনি তত ধরা দিবেন। নতুবা তিনি তো ডাকিতেছেন, শুনে কে ? তিনি তো ভুবনমোহনরূপে সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কিন্তু দেখে কে ? যাঁহার ভিতর দিয়া তাঁহার এই সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ ফুটিয়া বাহির হয়, তিনিই তাঁহার অবতার। অবস্থাভেদে অধিকারিভেদে কেহ তাঁহার সত্তার অবতার, কেহ তাঁহার চৈতন্যের অবতার, কেহ তাঁহার আনন্দের অবতার। যাঁহার ভিতর দিয়া তিনি যতটা ফুটিয়া বাহির হইয়াছেন, তিনি ততটা অবতার। যদি কাহারও ভিতর দিয়া পূর্ণভাবে ফুটিয়া বাহির হওয়া সম্ভব হয় এবং বাহির হন, তবে তিনি পূর্ণ অবতার। এইভাবে অংশাবতার ও পূর্ণাবতারের ভেদ কথিত হয়। শঙ্কর সক্রেটিস আদি জ্ঞানের অবতার, যীশু চৈতন্য আদি প্রেমের অবতার ; মহম্মদ নানক আদি তেজের অবতার। বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণকে পূর্ণাবতার মনে করেন। তাঁহার ভিতর দিয়া নাকি ভগবানের সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও একথা তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্বে' ও 'কৃষ্ণচরিত্রে' প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য রামভক্তেরা রামকে, শিবভক্তেরা শিবকে, মুসলমানেরা মহম্মদকে এবং খ্রীষ্টিয়ানরা যীশুখৃষ্টকে পূর্ণাবতার বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে। হিন্দুরা সব অবতারদেরেই যথেষ্ট

সম্মান করিতে প্রস্তুত ; কারণ তাঁহাদের মতে যেখানে যেখানে বিশেষ বিভূতির বিকাশ, তাহার ভিতর দিয়াই ভগবানের অনুসন্ধান করিতে হয়। গীতার 'যৎ যৎ বিভূতিমৎ সত্ত্বং' শ্লোকটীও এই ভাবেরই পোষক।

হিন্দু মতে সকলেই তাঁহার অবতার হইলেও কোন্ অবতারের উপদেশ মতে চলিতে হইবে, সে সম্বন্ধে একটু বিচার আবশ্যক। হিন্দুদের মতে সব ধর্ম্মের মধ্যেই প্রায় একটা ভিতরকার ভাব (essential points) আর একটা বাহিরের ভাব (non-essential points) দেখিতে পাওয়া যায়। ভিতরকার অন্তরঙ্গ-ভাবে কোনও ধর্ম্মের মধ্যেই প্রায় পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু বহিরঙ্গ-ভাব, যাহা দেশ কাল ও পাত্র সম্বন্ধে বিচার করিয়া নির্দ্ধারিত—যাহার প্রধান অংশ আচার-ব্যবহার রীতি নীতি লইয়া সীমাবদ্ধ, তাহা দেশ কাল ও পাত্রের দ্বারা শাসিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য। সে দিক দিয়া বিচার করিলে যে ধর্ম্ম যেখানকার জন্য নির্দ্ধারিত, তাহা সেইখানেই বিশেষভাবে শোভা পায়। মরুভূমির ধর্ম্ম পাহাড়ের উপরে কিংবা পাহাড়ের ধর্ম্ম মরুভূমিতে সম্যক্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। হিন্দুদের ইষ্টনির্দ্ধারণ গুরুকরণ আদির মধ্যে এ সব বিচার করা হইত। হনুমানের কৃষ্ণ শিব দুর্গা কালী কাহারও উপর ভক্তির নূন্যতা লক্ষিত না হইলেও রামচন্দ্র ছাড়া সে আর কাহারও কথা ভাবিবে না ভাবিতে

যাইবে না, ভাবিতে পারিবে না। গোঁড়ামি ছাড়িয়া দিয়া এই তত্ত্ব বিচার করিলে ইহার ভিতরে ধর্ম্মসাধনের বড় সুন্দর একটী সার্ব্বজনীন ভাব পরিদৃষ্ট হইবে। কে বড়, কে ছোট; কোন্ মত ভাল, কোন্ মত মন্দ—এ সব বিচার করিতে এই ভাবের তুলনা করিতে প্রকৃত সাধকেরা কখনও পছন্দ করেন না। আসল কথা কাজ করে যাওয়া, সংস্কার শিক্ষা ও রুচি অনুসারে যাহার যে ভাব শ্রেয় ও প্রেয় তাহা অবগত হইয়া তাহার অনুকূল পন্থা অবলম্বন করিয়া অন্য সব পন্থার উপর যথাসম্ভব ভক্তি রাখিয়া নিজের লক্ষ্য মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সেই আদর্শে জীবন গঠন করিয়া নিজের ভিতর ভগবৎকৃপায় সাধনবলে ভগবানের সত্তা চৈতন্য ও আনন্দকে ফুটাইয়া বাহির করিতে পারিলেই আসল কাজ সিদ্ধ হইবে। যে উপায়ে বা যে ভাবেই হউক, কোন মতে একবার সেই লক্ষ্যস্থানে গিয়া পৌঁছিতে পারিলেই দেখিতে পাইবে বুঝিতে পারিবে যে, সকলেই সেই দিকে ছুটিয়াছেন, সকল সম্প্রদায়ের সিদ্ধ-মহাত্মারা সেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। তখন বুঝিতে পারিবে সেখানে কোনও ভেদ নাই, ভেদ কেবল রাস্তার মাঝখানে; লক্ষ্যের যত নিকটে পৌঁছিতে থাকিবে ততই ভেদ-ভাব কমিয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। পরম তত্ত্ব যখন এক ছাড়া দুই নয়, সকলের উপাস্য যখন সেই এক ভগবান, তখন তাঁহাকে যে যে-ভাবে হউক না কেন প্রেমের সহিত পূজা করিলেই সে

পূজা গিয়া পরম প্রেমাস্পদের কাছে পৌঁছিবে—আমারই সেই প্রিয়তমের প্রীতিসাধন করিবে। আমার এই সাধন-ভজনের মধ্যে যদি কিছু ভুল-চুক থাকে, তবে তিনি নিজেই তাহা ঠিক করিয়া দিবেন; কারণ আমাদেরে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে তিনি নিজে যত ব্যস্ত, আমরা তাঁর কাছে যেতে তত ব্যস্ত নই।...

বলা বাহুল্য যে, যাঁহারা ভগবৎতত্ত্ব সাধনতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, বা কতকটা বুঝিলেও নিজের জীবনে সে সব সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারাই বিবাদ-বিসম্বাদ খণ্ডন-মণ্ডন নিয়া একটু বেশী ব্যস্ত থাকেন। আর যিনি সাধনা দ্বারা সে দেশের আনন্দ একটু আস্বাদ করিতে পাইয়াছেন, তিনি সেই পরম তত্ত্ব চরম সত্য সমস্ত জ্ঞানের আনন্দের প্রেমের মূল প্রস্রবণের কাছে ছুটে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হন যে, তখন আর তাঁহার এ সব নীচের ভূমিতে মন দিতে সময় থাকে না, তখন যে 'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে' —তাঁর জন্য সমস্ত দেহ সমস্ত প্রাণ সমস্ত মন সমস্ত আত্মা দিয়া অভিসার না করিয়া থাকা যায় না। বৈষ্ণবগণ রাধারাণীর অভিসারের মধ্য দিয়া এ তত্ত্ব আস্বাদ করিতে চেষ্টা করেন। তখন যে 'যুগায়িতং নিমেষেণ' এক নিমেষের বিলম্ব শত বৃশ্চিক যাতনার ন্যায় পীড়াদায়ক হয়।...

তার পরে যে বহিরঙ্গভাবের সাধনের মধ্যে আচার-

ব্যবহার লইয়া এত ভেদ লক্ষিত হয়, এত বিবাদ-বিসম্বাদ দৃষ্ট হয়, সাধকদের চোখে তাহার মধ্যে কিন্তু কোনও ভেদ নাই। তাঁহারা দেখেন সকলের লক্ষ্য যখন এক ভগবৎপ্রাপ্তি, সকলেই যখন তাঁহার পরম আত্মীয়, সকলেই যখন তাঁর আপনা জন; তখন আর এ সব বাহিরের বিষয় লইয়া আপনা জনদের মধ্যে অসদ্ভাব সৃষ্টি করা বিবেকীর কার্য্য নহে।

আমি ধর্ম্মগ্রন্থ কাহাকে বলি তাহা জানিতে চাহিয়াছ।...যে কোন গ্রন্থ ভগবানের সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের প্রকাশক ও পরিচায়ক তাহাই যে ধর্ম্মগ্রন্থ। প্রধান শাস্ত্র বেদ ভগবানের চিদ্বিভূতি। যে বেদ প্রকৃতির গায় লেখা রহিয়াছে, ঋষিরা অপরোক্ষ-দৃষ্টি লাভ করিয়া যে বেদের দর্শন পান, বলা বাহুল্য সে বেদ গ্রন্থ-বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়; ভগবান যেমন অনাদি তাঁহার চিদ্বিভূতি যেমন অনাদি, সেই বেদও তেমনই অনাদি। হিন্দুদের বেদ মুসলমানদের কোরাণ খ্রীষ্টিয়ানদের বাইবেল, সেই বেদের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। ভগবানের স্বরূপ গুণাতীত নির্গুণ নিরাকার অব্যক্ত অচিন্ত্য, জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি; জগতের মধ্য দিয়া তিনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন—জগৎই তাঁহার শরীরস্থানীয়। স্থূল জগৎ সমষ্টিভূত স্থূলশরীর শ্রীভগবানের স্থূল মূর্ত্তি, সূক্ষ্ম জগৎ সমষ্টিভূত সূক্ষ্মদেহ শ্রীভগবানের সূক্ষ্ম রূপ, কারণ-জগৎ সমষ্টিভূত কারণ-দেহ শ্রীভগবানের কারণ-শরীর; সুতরাং যাহা তাঁহার স্থূল-দেহ সূক্ষ্ম-দেহ ও কারণ-দেহের

তত্ত্বনির্ণয়ে সচেষ্ট তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত, তাহা সবই যে আমার ধর্ম্মগ্রন্থ। গণিত বিজ্ঞান রসায়ন জ্যোতিষ শারীর-বিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান আদি যে সব বিদ্যা তাহার স্থূল বিভূতির ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব আবিষ্কারে ও প্রচারে ব্যস্ত, আমার অভিধানে তাহারা স্থূলবিষয়ক ধর্ম্মশাস্ত্র। উদ্ভিদবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান ন্যায়শাস্ত্র কামশাস্ত্র প্রভৃতি সেই সর্ব্ব-ব্যাপী মননশক্তির সাধারণ মনের * গূঢ় রহস্য আবিষ্কারে এবং প্রচারে সচেষ্ট বলিয়া আমি ইহাদেরে সূক্ষ্ম বা মানসিক ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া মান্য করি। আর দর্শন উপনিষৎ বেদ ভাগবত কোরাণ বাইবেল প্রভৃতি যে সব গ্রন্থ আমার ভগবানের কারণ-শরীরের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিরূপণের এবং প্রচারের কাজে নিযুক্ত আমি তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মশাস্ত্র মনে করি। যে সব মহাত্মা ভগবৎবিভূতির ভগবৎশক্তির ভগবৎবিকাশের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ-তত্ত্ব নির্দ্ধারণে ব্যস্ত, আমি তাঁহাদেরে ঋষিতুল্য মনে করিয়া ভক্তি করি। ব্যাস, গৌতম, কণাদ, লুক্, ম্যাথু, হ্যামান, হেগেল, নিউটন, পাস্কাল, হাক্সলি, টিণ্ডাল আদি—ইঁহারা সকলেই আমার নমস্য। আমার ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তকালয়ে এ সব সম্বন্ধে প্রধান প্রধান গ্রন্থ, এমন কি বড় বড় কবিদের ভাবুকদের প্রচারকদের গ্রন্থও অতি সমাদরে রক্ষিত হয়। আসল কথা এই যে, যে জিনিস যে বস্তু আমার চিত্তে

* There is a mind common to all.—Emerson.

ভগবৎভাব জাগাইয়া তোলে, যাহার অবলম্বনে আমার চিত্তে ভগবৎবিকাশের ভগবৎঅনুভূতির সাহায্য হয়, তাহাই আমার ধর্ম্মগ্রন্থ। যে গ্রন্থের মধ্য দিয়া আমি তাঁহাকে যত বেশী বিকশিত দেখিতে পাই, সেই গ্রন্থই তত বেশী পরিমাণে আমার শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করে। বলা বাহুল্য, আজকাল আমার নিকট হিমালয় পাহাড় গঙ্গানদী নিবিড় অরণ্য মুক্ত আকাশ গাছপালা পাখী চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারাই প্রধান প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। আবার যখন লোকালয়ে যাই, তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই আমার সর্ব্বপ্রধান ভগবৎগ্রন্থ বা ভগবৎবিগ্রহরূপে প্রাণের পূজা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।...

মন্দির সম্বন্ধে আর কি বলিব? যে বস্তু বা যে ব্যক্তির মধ্য দিয়া আমার ভগবৎঅনুভূতি সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়, তাহাকেই আমি ভগবানের মন্দির মনে করি। যাহার ভিতর ভগবান থাকেন তাহাই তো তাহার মন্দির। এই-ভাবে সুবিশাল জগৎব্রহ্মাণ্ডই আমার ভগবৎমন্দির 'সুবিশাল-মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্'। তার পরে যে সব মন্দির গির্জ্জা বা মসজিদে ভক্তেরা সমবেত হইয়া বা পৃথক পৃথক ভাবে ভগবানের উপাসনা করেন, সে স্থানগুলিকেও আমি ভগবৎ-উপাসনার ক্ষেত্র বা মন্দির বলিয়া সম্মান করি। বলা বাহুল্য, অনেক অনেক প্রসিদ্ধ মন্দিরে গিয়া সেখানকার পূজারীদের কারবারদের দর্শকবৃন্দদের মধ্যে একটুও ভক্তির ভাব না দেখিয়া

বরং উহার বিপরীত ভাব দেখিয়া, সেই সব সুদৃশ্য মার্ব্বেল-প্রস্তরনির্ম্মিত শোভন স্থানগুলিকে আমি মন্দির বলে ধরিতে পারি নাই। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে একদিন টিকিতে না পারিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছিল! তারপর অনেক দূরে একটা বৃক্ষসমীপে বসিয়া সেই গাছটীকে মন্দির-রূপে উপলব্ধি করিয়া তাহার ভিতরে ভগবানের পূজা করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছিলাম।...

আমি কাহাকে সাধনা বলি জানিতে চাহিয়াছ। কোথায় কোথায় সাধু সাধক দর্শন করিয়াছি শুনিলেই আমার সাধনার একটু আভাস পাইবে। একদিন ঝড়ের সময় নদীর ভিতর একখানা নৌকা ডুবিয়া যায়। সেই নৌকায় যত লোক ছিল, অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিল; কিন্তু একটা বৃদ্ধা রমণী কিছুতেই আত্মরক্ষায় সমর্থা হইল না। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন বলিষ্ঠ ব্যক্তি তীরে দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী আঠার বৎসরের যুবক কোনও দিকে না তাকাইয়া নদীতে লাফাইয়া পড়িল এবং অতি কষ্টে রমণীর প্রাণরক্ষা করিল। আমি তখন সেই যুবককে সাধক বলিয়া নমস্কার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। আর একদিন কাশীতে বর্ষাকালে একটী যুবক গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। একজন সাধু সকলের নিষেধ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িয়া যুবকের প্রাণরক্ষা করিলেন। আমি তখন সেই সাধুর মধ্যে একজন

সাধক দর্শন করিয়াছিলাম। আর একদিন রামপুর-হাটে এক ধোপাবাড়ী আগুন লাগে। তখন স্কুলের সব ছেলেরা সেখানে আগুন দেখিতে দৌড়াইয়া যায়। হঠাৎ একখানা ঘরের মধ্য হইতে একটা করুণ-স্বর শুনা গেল। অমনি একটা যুবক সেই আগুনের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। ভগবানের বিশেষ কৃপায় উভয়ের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। আমি সেই যুবকের মধ্যে একটী সাধকের দর্শন পাইয়াছিলাম। মা যখন ছেলেমেয়ের অসুখ উপলক্ষ্যে মাসাবধি রাত্রি জাগিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও বিন্দুমাত্র ক্লান্তি-বোধ করেন না, তখন সেই মার মধ্যে আমার একজন পরম উন্নত সাধকের দর্শনলাভ হয়। স্ত্রী যখন বহু বৎসর ধরিয়া রুগ্ন স্বামীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন, তখন সেই স্ত্রীর ভিতরেও আমি উচ্চাঙ্গের সাধিকার দর্শনলাভ করি। পাঠ্যাবস্থায় গুরু ডাক্তার বসু এক দিন একটার সময় আমাকে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া দেখা করিতে বলেন। আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেখানে গিয়া এক ঘণ্টা তাঁহার সামনে বসিয়া চলিয়া আসি। পরদিন কলেজের পরে কেন দেখা করিতে যাই নাই জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। সেইদিন তাঁহার সেই তন্ময় অবস্থার মধ্যে আমি একজন অতি শ্রেষ্ঠ সাধকের দর্শন পাইয়াছিলাম। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারে তন্ময় হইয়া যান, যাঁহারা সেবাধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করেন, যাঁহারা প্রেমাস্পদের রক্ষার জন্য, সেবার জন্য আপনার সুখদুঃখ ভুলিয়া যান, আমি তাঁহাদের

মধ্যে অনেক সাধক দেখিতে পাই। মেথর যদি পায়খানা পরিষ্কার করিবার সময় মনে করিতে পারে যে, সে জীবের সেবার জন্য শিবের সেবার জন্য এ কাজ করিতেছে; তবে তাহার ভিতরে তখন আমি যে সাধু দেখিতে পাইব, লোভী পূজারার ভিতরে বেশধারী জটাধারী অনেক সাধুদের মধ্যে সে রকম সাধু খুঁজিয়া পাইব না। যখন কোনও মন্দিরে অশিক্ষিতা নিম্ন-জাতীয়া কোনও রমণীকে 'গোবিন্দ' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে দেখি, তখন তাহার ভিতরে উচ্চাঙ্গের সাধনা দর্শন করিতে পাই। অনেক বিখ্যাত মঠে গিয়া বাস করিয়া সাধু খুঁজিয়া পাই নাই; অথচ অনেক গরীব গৃহস্থের পর্ণ-কুটীরে সাধুদর্শন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। বৃন্দাবনে শ্রেষ্ঠ সাধুদর্শন কোথায় হইয়াছিল মনে আছে কি? কোনও মন্দিরে নয় আশ্রমে নয় কোনও মোহান্ত বাবাজী বা গোঁসাইএর মধ্যে নয়, একজন সাধারণ চামারের মধ্যে! চারি আনার বেশী দরকার হয় না বলিয়া অন্যে যখন ছয় আনা লইত, তখনও সে চারি আনার মজুরীতে কাজ করিত; এবং সেই চারি আনার দুই আনা ধর্ম্মকার্য্যে ও গরীবের সেবায় ব্যয় করিত। কাজের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটু মিষ্টি ও জল খাইতে বলায় সে হাতজোড় করিয়া বলিয়াছিল, আমি নেমক-হারাম হইতে পারিব না। তাহার জলপাত্রের মধ্যে ছিল নিজের অঞ্জলি, এবং জলাধারের মধ্যে ছিল একমাত্র যমুনা। রুটী তৈয়ার করিবার জন্য এক-

খানা তাওয়াও তাহার সম্বল ছিল না। সমস্ত রাত্রিব্যাপী তাহার ভজনানন্দে যোগদান করিয়া তাহার মুখে ভগবৎতত্ত্ব শুনিয়া নিজের জীবন সার্থক মনে করিয়াছিলাম। লোকের নিকট একটু প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া বৃন্দাবন হইতে এই ব্যক্তি যে কোথায় চলিয়া গেলেন, সে খবর আর কেহ বলিতে পারিল না। বড় বড় প্রসিদ্ধ সাধুদের কাছে গিয়া তাহাদের শিষ্য করিবার প্রবৃত্তি, প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, সামান্য কাপড় দুই-একখানা গ্রন্থের উপর অত্যাসক্তি ও অর্থপিপাসা দেখিয়া, সেখানে সাধুর দর্শন সাধনার দর্শন না পাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। যেখানে লক্ষ্য শুধু ভগবৎপ্রাপ্তি সেখানে সাধনা-দেবীর দর্শন পাওয়া যায়, আর যেখানে লক্ষ্য শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠা সুখস্পৃহা সেখানে অস্টাঙ্গ-যোগ পরা ভক্তি দর্শন-মীমাংসাদির দিনরাত্রি-ব্যাপী আলোচনা ও অনুষ্ঠানের মধ্যেও যে সাধনা-সতী বাস করিতে ইচ্ছা করেন না। যাহা ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় তাহাই আমার মতে সাধনা। যে কাজ বা যে ভাব ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে কাহারও ভগবৎপ্রাপ্তির, সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ-বৃদ্ধির পূর্ণতা-লাভের সহায়, তাহাই যে সাধনা। যম নিয়ম আসন সমাধি, রাগমার্গের রাগানুগ-মার্গের অনুষ্ঠানসকল, পঞ্চতত্ত্ব-বিবেক পঞ্চ-কোষ-বিবেক ষট্‌চক্রভেদ আদি শুধু চিত্তশুদ্ধি করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত হইলে, জ্ঞানযোগ লয়যোগ রাজযোগ কর্ম্মযোগ শুধু ভগবৎঅভিমুখে চালিত করিলে, এসব যে

উচ্চাঙ্গের সাধনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সকলের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠালাভ বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি হইলে আমি ইহাদেরে সাধনা বলিব না; বরং নিষ্কামভাবে অজ্ঞানীকে জ্ঞানদান, বিপন্নকে উদ্ধার, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান, কুপথগামীকে সুপথে আনয়ন, ক্ষুধিতকে অন্নদান, পিপাসাতুরকে জলদান, রোগীকে ঔষধদান সেবাদান—ইহার সবই সাধনা মনে করিব। পিতা-মাতার সেবা, স্বামীর সেবা, পুত্রকন্যার সেবা, অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, পশুপক্ষীদের অন্নদান, বৃক্ষমূলে জলসেচন, পথনির্ম্মাণ, পান্থশালানির্ম্মাণ, জলাশয়-খনন—এসব কার্য্যের উদ্দেশ্য যদি জীবের ভিতর দিয়া শিবের সেবা হয়, তবে এসবও যে সাধনার অঙ্গবিশেষ। প্রাচীন হিন্দুদের ব্রত পূজা প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠানের সঙ্গে পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি নিত্যকর্ম্মের সঙ্গে এইজাতীয় সাধনার যোগ ছিল। তারতম্যানুসারে সচ্চিদানন্দের বিকাশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক উপায়, যাহার পক্ষে যেটা উপযোগী সেই উপায়, অবলম্বন করিয়া সচ্চিদানন্দের দিকে পূর্ণ পরিণতির দিকে নিজে অগ্রসর হইতে থাকা এবং অন্যকে তাহাদের সাধনভজনের আপন আপন প্রথানুসারে চলিতে সাহায্য করাই ব্যক্তিবিশেষের সাধনা বলিয়া কথিত।...

যাহার সাধন-চক্ষু দিব্য-দর্শন খুলিয়া গিয়াছে, সে-ই দেখিতে পায় যে সমস্ত প্রকৃতিই ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে সেই পরম পিতার সাধনা করিতেছে; সকলেই সজ্ঞানে অজ্ঞানে 'পরাণের টানে'

তাঁর পানে ছুটিয়াছে। প্রকৃতির এই সাধনা লক্ষ্য করিয়াই তো সাধক-ভক্ত গান করিয়াছিলেন ঃ—

তাঁরে আরতি করে চন্দ্র-তপন, দেব-মানব বন্দে চরণ
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগত-মন্দিরে !
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি, পায় দেয় ধরা কুসুম ঢালি
কতই বরণ কতই গন্ধ কত গীত কত ছন্দরে।

আমাদের সাধনাও যে আমাদের এই ব্যষ্টি-প্রকৃতিকে সেই সমষ্টি-প্রকৃতির তালের সঙ্গে মিলাইয়া সেই প্রকৃতির অন্তরাত্মা পরমেশ্বরের সেবার তৃপ্তির যথাসম্ভব সহায় হওয়া। এই-ভাবে সাধনা দ্বারা আমাদের দেহ মন প্রাণ তাঁহার সান্নিধ্যে তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া সর্ব্বত্রই সেই রসস্বরূপের আস্বাদে বিভোর হইয়া পড়িবে। এই অবস্থায়ই তো আমাদের ভিতর দিয়া সেই সচ্চিদানন্দের ফুটিয়া বাহির হওয়া সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া যাইবে। নিজের ভিতর দিয়া এই ভাবে তাঁহার অবারিত প্রকাশ সাধিত হইয়া গেলে তখন যে সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রকাশ তাঁহার লীলাবিভূতি দর্শন হইতে আরম্ভ হইবে। তখনই আমরা অনুভব করিব 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি'।

ওঁ শান্তিঃ